POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ
فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰٮنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا
تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ

এবং তাহার জাতি তাহার সহিত বিতর্ক করিল। তখন সে বলিল,'তোমরা কি আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে তর্ক করিতেছ, অথচ তিনি আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন? এবং তোমরা যাহাকে তাঁর সহিত শরীক করিতেছ উহাকে আমি আদৌ ভয় করি না, – আমার প্রভু যাহা চাহিবেন তাহা ব্যতিরেকে।

(আল আনআম: ৮২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 31

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 আগস্ট, 2022 5 মহররম1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রিযক-এ স্বাচ্ছন্দ্য এবং দীর্ঘায়ুল লাভের উপায়।

১৮৮৫) হযরত আনাস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: যে রিযকে স্বাচ্ছন্দ্য চায় (এবং পুণ্যকর্মে বেশি বেশি সুযোগ পেতে চায়) এবং দীর্ঘায়ু হতে চায় সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলে।

সিলসিলার সম্পদ দিয়ে ব্যবসা প্রসঙ্গে।

২০৭০ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: যখন হযরত আবু বাকার সিদ্দীক খলীফা পদে আসীন হন তখন তিনি বলেন- আমার জাতি নিশ্চয় জানে যে, আমার এতটা সম্পদ ছিল না যা থেকে পরিবারে ভরণ পোষণ করতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়েছি। অতএব, আবু বাকার-এর পরিবার এখন বায়তুল মাল থেকে নিজের খরচ নির্বাহ করবে এবং সে (আবু বাকার) মুসলমানদের জন্য সেই সম্পদ থেকে ব্যবসা করবে। (এবং ব্যবসা দ্বারা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে থাকবে)

সাহাবাগণ নিজের কাজ নিজেই করতেন।

২০৭১) হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবাগণ নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন আর তাদের ঘামের গন্ধ পাওয়া গেলে তাদেরকে বলা হল- তোমরা গোসল করে নিলে ভাল হয়।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা,১ জুলাই ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

খোদা তা'লা শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

যখন কি না এই সব বিষয় থেকে জানা গেল যে প্রকৃত তাকওয়া ছাড়া কোন স্বস্তি ও আনন্দ লাভ সম্ভবই নয়, অতএব একথা জানতে হবে যে তাকওয়ার অনেকগুলি আনুষঙ্গিকতা রয়েছে যা মাকড়সার জালের ন্যায় প্রসারিত। তাকওয়ার সম্পর্ক মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধর্মবিশ্বাস, জিহ্বা নৈতিকতা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল বিষয়টির সম্পর্ক জিহ্বার সঙ্গে। অনেক সময় মানুষ তাকওয়া সরিয়ে রেখে কোনও কথা বলে ফেলে আর তার নিজের ভাষ্য নিয়ে মনে মনে আনন্দিত হয়। যদিওসেই কথাটি অনৈতিক। এই বিষয়ে আমার একটি গল্প মনে পড়ে। এক পুণ্যাত্মাকে এক ঘোর সংসারবাদী ব্যক্তি আমন্ত্রিত করে। সেই পুণ্যাত্মা যখন নেমন্তণ রক্ষার জন্য উপস্থিত হলেন তখন সেই অহংকারী বস্তুবাদী ব্যক্তি তার ভৃত্যকে বলল, 'অমুক থালাটি নিয়ে এস যেটি আমি প্রথম হজ্জের সময় এনেছিলাম।' এর পর সে বলল, 'দ্বিতীয় থালাটিও নিয়ে এস যেটি দ্বিতীয় হজ্জের সময় আমি এনেছিলাম। ' এরপর বলল তৃতীয় হজ্জের সময় নিয়ে আসা থালাটিও নিয়ে এস। সেই পুণ্যাত্মা তাকে বললেন-তোমার অবস্থা তো বড়ই দয়নীয়। এই তিনটি বাক্যে তুমি তোমার তিনটি হজ্জের সর্বনাশ করে ছাড়লে। এই কথাগুলি বলার পিছনে তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তুমি যে তিনটি হজ্জ করেছ তা আমার কাছে প্রকাশ করা। এই কারণে খোদা তা'লা শিক্ষা দিয়েছেন, নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

সমস্ত মানবাত্মাকে একত্রিত করা হবে, তাদের শরীর যে যুগেরই হোক না কেন, আর সমস্ত জাতির নবীদের সামনে আনা হবে আর তারা নিজেদের জাতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

এই যে বলা হয়েছে- কিয়ামতের দিন আম্বিয়াগণকে সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করানো হবে- আমার মতে আম্বিয়াগণের সাক্ষ্য বলতে তাদের দৃষ্টান্তকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐশী বাণী তাদের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তার নমুনা তারা পেশ করবেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা নহল এর ৭২ নং আয়াত

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ
لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই মহা অপরাধের উল্লেখের পর পরলৌকিক জীবন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ইহকালেই এই অপরাধের শাস্তি মিলবে, কিন্তু পরকালে এর থেকেও বেশি শাস্তি পাবে আর সেই শাস্তি ও লাঞ্ছনা অত্যন্ত কঠোর হবে। কেননা সমস্ত মানবাত্মাকে একত্রিত করা হবে, তাদের শরীর যে যুগেরই হোক না কেন, আর সমস্ত জাতির নবীদের সামনে আনা হবে আর তারা নিজেদের জাতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। অতএব মানুষ সেই সময়ের লাঞ্ছনার কথা কেন স্মরণ করে না। অন্যত্র এই লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করা বলা হয়েছে -

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ...
يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ
تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ

অর্থাৎ যখন সমস্ত জাতি এবং নবীদের একত্রিত করা হেব সেই সময় তারা এতটাই লজ্জিত হবে তারা বাসনা করবে যে ভূমি বিদীর্ণ হয়ে যাক আর তার মধ্যে তারা প্রবেশ করুক।

এই আয়াত থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী প্রেরণ করেছেন। কুরআন করীম এই মতবাদ বিভিন্ন আয়াতে বর্ণনা করেছেন। আর এটি অন্যান্য সকল ধর্ম থেকে অনন্য আর এর সত্যতার প্রমাণে এটি একটি শক্তি শালী প্রমাণ।

এই যে বলা হয়েছে যে কাফেরদেরকে সেই সময় অনুমতি দেওয়া হবে না- অনেকে এর অর্থ করেছে- তাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হবে না। এই অর্থটি সঠিক নয়। কেননা কুরআন করীমের একাধিক আয়াত থেকে প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন কুফফার আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কথা বলবে আর

এরপর ৯ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৯ সালের কাদিয়ান জলসার সমাপনী অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর ভাষণ

আজ এ বছরকার জলসা সালানা কাদিয়ানের শেষ দিন আর জলসার এটি শেষ অধিবেশন। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রায় ১৮/১৯ হাজার আহমদী সেই গ্রামে সমবেত যা যুগ–ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)–এর নিজস্ব গ্রাম। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী যিনি মহানবী (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী ও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুসারে এ যুগে মহানবী (সা.) আনিত ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।তিনি যেখানে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষানুসারে বান্দাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের পথ দেখিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনের আকর্ষণীয় শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করেছেন সেখানে মহানবী (সা.)–এর মহিমা ও সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে অবহিত করে কেবল সাধুপ্রকৃতির মানুষ এবং ইসলামের ওপর অমুসলিমদের হামলায় বিপর্যস্ত মুসলমানদের ঈমানকেই দৃঢ় করেন নি বরং নবী করীম (সা.)–এর সত্তায় আপত্তিকারী সকল ইসলাম বিরোধীর মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর যুক্তিপ্রমাণ সমৃদ্ধ প্রতি–আক্রমণের মুখে ইসলাম বিরোধীদের পলায়ন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তাঁর রসূল প্রেমের মান এমন ছিল, যে মানে কেউ উপনীত হতে পারে নি আর পারবেও না। এই রসূলপ্রেম আর এ কারণে তাঁর সাথে অনুগ্রহপূর্ণ খোদার ব্যবহার এবং তাঁর প্রতি অগণিত ঐশী নেয়ামত বর্ষিত হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'এক রাতে এই অধম এত অজস্র ধারায় দরূদ পাঠ করে যে, অন্তরাত্মা এর ফলে বিমোহিত হয়ে যায়। একই রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, ফেরেশতারা স্বচ্ছসুপেয় পানিসদৃশ জ্যোতির মশক এই অধমের ঘরে নিয়ে আসে (অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার পানির মশক নিয়ে এসেছে)। তাদের একজন বলে, এ হলো সেই কল্যাণরাজি যা তুমি মুহাম্মদ (সা.)–এর প্রতি প্রেরণ করেছ। (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ৫৭৬, উপ–পাদটীকা ৬)পুনরায় তিনি বলেন, একবার এলহাম হয়, যার অর্থ ছিল উর্ধ্বলোকের সৃষ্টি বিতণ্ডায় লিপ্ত, অর্থাৎ ধর্মের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্তে ঐশী ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু এখনো উর্ধ্বলোকে সঞ্জীবনকারী কে তা নির্ধারিত হয় নি; তাই তারা মতভেদে লিপ্ত। তিনি বলেন, ইত্যবসরে স্বপ্নে দেখি মানুষ ধর্মকে সঞ্জীবনকারী ব্যক্তির সন্ধান করছে আর এক ব্যক্তি এই অধমের সামনে আসে এবং ইঙ্গিতে বলে, 'হাজা রাজুলুন ইউহিব্বুরসূলাল্লাহ্' অর্থাৎ ইনি–ই সেই ব্যক্তি যিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে ভালোবাসেন। আর এই উক্তির অর্থ ছিল– এই পদ লাভের সবচেয়ে বড় শর্ত হলো রসূলপ্রেম। অতএব, তা এই ব্যক্তির মাঝে প্রমাণিত (বিদ্যমান)।তিনি বলেন, অতএব রসূল প্রেমের কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই পদমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর এসব কথা শুনে সাধারণভাবে মুসলমানদের এবং বিশেষভাবে আলেম সমাজের উচিত ছিল, মহানবী (সা.)–এর এমন নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রেরিত এই মহাপুরুষের সঙ্গ দেয়া। কিন্তু আলেমরা, বলা উচিত নামধারী আলেমরা, তাদের হৃদয়ের কঠোরতা, অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি অপবাদ আরোপ করা আরম্ভ করে আর আজও সেই একই অপবাদ আরোপ করে চলেছে যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি মহানবী (সা.)–এর পদমর্যাদাকে খাঁটো করেন, তাই তিনি কাফের এবং তাঁর মান্যকারীরাও কাফের। অথচ এর বিপরীতে আমরা যখন রসূলপ্রেম সম্পর্কে তাঁর অগণিত রচনাবলী দেখি; আরবী, ফারসী ও উর্দূভাষায় তাঁর বইপুস্তক, বক্তব্য ও কবিতা দেখি, তখন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মহানবী (সা.)–এর প্রতি তাঁর প্রেম ও ভালোবাসার মানে কেউ পৌঁছতে পারবে না। তাঁর প্রতিটি শব্দ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.)–এর ভালোবাসায় নিবেদিত ও বিলীন হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বিভিন্ন দেশে সৎ প্রকৃতির আলেমও রয়েছে, সেই সব আলেম এবং সাধারণ মুসলমানদের সামনে যখন একথা প্রকাশ পায়, তখন তারা তাঁর হাতে বয়আত করে তাঁর দাসত্ব বরণ করে আর এভাবে সত্যিকার অর্থে তারা মহানবী (সা.)–এরই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। তিনি (আ.) তাঁর এক ফার্সি পঙ্‌ক্তিতে লিখেন–অর্থাৎ, খোদার পর আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রেমে বিভোর। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি এমন ভালোবাসা যদি কুফর বা অবিশ্বাস হয়ে থাকে তাহলে খোদার কসম! আমি সবচেয়ে বড় কাফের। একইভাবে কবিতার আদলে তাঁর আরবী রচনাবলী এমন যা পড়ে আরবরাও অভিভূত (আর বলে), মহানবী (সা.)–এর প্রশংসায় এবং প্রেম ও ভালোবাসায় সমৃদ্ধ এমন রচনা আমরা কখনো পড়িও নি আর শুনিও নি। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের মুসলমানদের এই রসূল প্রেমিককে চেনার বা মানার তৌফীক দিন। কোন যৌক্তিকতা বা উপযোগিতার নামে কিংবা আলেমদের ভয়ে, বরং বলা উচিত দুষ্ট আলেমদের ভয়ের কারণে মুসলমানরা যেন খোদাপ্রেরিত এ রসূল প্রেমিককে অস্বীকার করে খোদার ক্রোধভাজন না হয়। পাপাচারী আলেমদের কথা বলতে গিয়ে আমার একটি কৌতুক মনে পড়ে গেল। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক মৌলানা আহমদীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছিল আর কুফরি ফতোয়াও লেপন করছিল কিন্তু সে তার অজ্ঞতার কারণে বা কথার ধারাবাহিকতায় এটিও বলে বসে আর বেশ কয়েকবার বলে যে, অমুক মওলানা, যে আমাদের বড় মৌলবী, সে দুষ্ট আলেম বা 'ওলামায়েসু'–এর অন্তর্ভুক্ত। সেও আমাদের সম্পর্কে এই ফতোয়া দিয়ে রেখেছে যে, আহমদীরা কাফের। যাহোক আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা আমরা সব সময়ই বলি যে, এসব ফতোয়া পাপাচারী আলেমরাই দিয়ে থাকে। কোন খোদাভীরু সত্যিকার আলেম এমন ফতোয়া দিতে পারে না। যাহোক এরা বলুক বা না বলুক, খোদার প্রেরিত মহাপুরুষের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে এরা পাপাচারী আলেমদের মাঝেই গণ্য হয়।

এখন আমি মহানবী (সা.)–এর প্রেম ও ভালোবাসায় বর্ণিত এই রসূল প্রেমিকের

বিভিন্ন কথা এবং তাঁর পবিত্র পদমর্যাদা ও মহিমা প্রকাশক কিছুউদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যার একেকটি শব্দ তাদের মুখে চপেটাঘাতস্বরূপ যারা আহমদীদের ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–কে কাফের আখ্যা দেয়। নবীকুল শ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর সর্বোত্তম মুরব্বী বা প্রশিক্ষক হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সত্য কথা হলো, সব নবীর মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন সেই নবী যিনি পৃথিবীর সবার চাইতে বড় ও মহান শিক্ষক। অর্থাৎ, সেই নবী যার হতে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ নৈরাজ্যের অবসান ঘটেছে। হারানো ও দুষ্প্রাপ্য একত্ববাদকে যিনি পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যুক্তিপ্রমাণের জোরে প্রচলিত মিথ্যা ধর্মগুলোকে যিনি পরাজিত করে ভ্রষ্টদের সন্দেহ দূরীভূত করেছেন। সকল সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির সন্দেহ যিনি নিরসন করেছেন আর সত্য নীতি–সংক্রান্ত শিক্ষার আলোকে নতুনভাবে মুক্তি বা পরিত্রাণের প্রকৃত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যার জন্য কোন নিষ্পাপকে ফাঁসি দেয়া এবং খোদাকে তাঁর আদি ও চিরস্থায়ী আসন থেকে অপসারণ করে কোন নারীর গর্ভে প্রবিষ্ট করানোর প্রয়োজন নেই।সুতরাং এই সব প্রমাণের নিরিখে তাঁর পদমর্যাদা সবচেয়ে বড়। কেননা তাঁর কল্যাণ ও উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। এখন ইতিহাস বলে, ঐশীগ্রন্থও সাক্ষী আর যাদের চোখ আছে তারাও দেখে যে, সেই নবী যিনি এই রীতি অনুসারে নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। (বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম ও ২য় খণ্ড, টীকা ৬, পৃ. ৯৭) এরপর রসূলে করীম (সা.)–এর সত্যবাদিতা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) সে যুগে প্রেরিত হয়েছেন, যখন সারা পৃথিবীতে শিরক, ভ্রষ্টতা ও সৃষ্টিপূজার রাজত্ব ছিল। সকলেই সত্য নীতি বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। সকল ফির্কা সঠিক পথ ভুলে এবং অন্যদের ভুলিয়ে বিদাতের নতুন নতুন পথ অনুসরণ করছিল। আরবে প্রতিমাপূজা ছাড়াও আরো শত শত প্রকার সৃষ্টিপূজা বিস্তার লাভ করেছিল। সে যুগেই অনেক পুরাণ (হিন্দুগ্রন্থ) এবং অন্যান্য পুস্তক লেখার কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যা অনুসারে খোদার বহু বান্দাকে খোদা বানানো হয়েছে এবং অবতার পূজার ভিত রচিত হয়েছে। পাদ্রী ডেভন পোর্ট এবং আরো অনেক বিজ্ঞ ইংরেজের উক্তি অনুসারে সে যুগে খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বেশি বিকৃত ছিল না। পাদ্রিদের নোংরা চালচলন ও নোংরা বিশ্বাসের কারণে খ্রিষ্টধর্ম মারাত্মকভাবে কলঙ্কিত হয় আর খ্রিষ্টধর্মের এক বা দু'ব্যক্তি নয় বরং

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

‘আল্লাহ্ তা’লা তোমাদের জন্য শয়তানের দলকে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং যুদ্ধকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি প্রথমে স্থলে তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়েছেন যেন সেই নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তোমরা সমুদ্রপথেও শিক্ষা লাভ করতে পার। নিজ শত্রুর দিকে অগ্রসর হও, সমুদ্রের বুক চিরে তাদের দিকে অগ্রসর হও, কেননা আল্লাহ্ তা’লা তোমাদের জন্যই তাদেরকে একত্রিত করেছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ব্যাখ্যার আলোকে হযরত মূসা (আ.)-এ হিজরতের সময় সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়ার মোজেযার বিস্তারিত ব্যাখ্যা।

বাহারীন এবং ইয়েমেনের এলাকায় মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে অসাধারণ বিজয় লাভ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১ জুলাই , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (২৪ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে মুরতাদ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নবম যুদ্ধাভিযান তথা ‘বাহরাইনের অভিযান’-এর বর্ণনা চলছিল। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ যা দেয়া হয় তা হযরত আ’লা বিন হাযরামী (রা.)-এর হুতুমের বিরুদ্ধে সেনাঅভিযান সম্পর্কিত। বর্ণিত আছে, হযরত আ’লা (রা.) হযরত জারুতকে এই আদেশ দেন যে, তুমি আব্দুল কায়স গোত্রকে সাথে নিয়ে হুতুমের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে হাজার থেকে (হুতুম) সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে শিবির স্থাপন কর। এদিকে হযরত আ’লা (রা.) নিজ সৈন্যসামান্ত নিয়ে হুতুমের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকায় আগমন করেন। দারীনের অধিবাসী ছাড়াও সকল মুশরিক হুতুমের কাছে গিয়ে একত্রিত হয়। একইভাবে সকল মুসলমান হযরত আ’লা বিন হাযরামী (রা.)-এর কাছে গিয়ে একত্রিত হয়। উভয় বাহিনী নিজেদের সম্মুখে পরিখা খনন করে। প্রতিদিন তারা নিজ নিজ পরিখা পার হয়ে শত্রুর ওপর আক্রমন করতো আর যুদ্ধ শেষে পুনরায় খন্দকের পেছনে প্রত্যাবর্তন করত। এক মাস ধরে এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। ইতিমত্যে এক রাতে মুসলমানরা শত্রুশিবির থেকে অনেক হইচই ও চিৎকার চেচামেচি শুনতে পায়। তখন হযরত আ’লা (রা.) বলেন, কেউ কি আছে যে শত্রুর প্রকৃত অবস্থা জেনে আসবে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হাযাফ বলেন, আমি এ কাজ করতে যাচ্ছি আর তিনি ফেরত এসে খবর দেন, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা নেশায় মত্ত হয়ে আছে আর নেশায় বুদ হয়ে আবোলতাবোল বকছে। এই কারণেই এত হইচই ও চিৎকার চেচামেচি শোনা যাচ্ছে।

একথা শোনা মাত্র মুসলমানরা তড়িৎ শত্রুর ওপর আক্রমণকরে এবং শিবিরগুলোতে ঢুকে তাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে শুরু করে। তারা (তথা শত্রুসেনারা) নিজেদের খন্দকের দিকে পলায়ন করে এবং অনেকে খন্দকে পড়ে মারা যায়, অনেকে বেঁচে যায়, অনেকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়, অনেককে হত্যা অথবা বন্দী করা হয়। মুসলমানরা তাদের শিবিরের সব জিনিস হস্তগত করে। যে ব্যক্তি পলায়ন করতে সমর্থ হয় সে কেবল ততটুকুই নিয়ে পালাতে সক্ষম হয় যতটুকু তার শরীরে ছিল। মোটকথা আবজার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। হুতুমের ভীতবিহ্বলতার অবস্থা এমন ছিল যেন তার দেহে প্রাণই নেই। সে নিজ ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু মুসলমানরা ততক্ষণে মুশরিকদের শিবিরে ঢুকে গিয়েছিল। হুতুম হতবুদ্ধি হয়ে স্বয়ং মুসলমানদের মাঝ থেকে পলায়ন করে নিজ ঘোড়ায় আরোহন করতে অগ্রসর হয়। ঘোড়ার পাদানিতে সে পা রাখতেই পাদানি ছিঁড়ে যায় এবং হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। মুশরিকদের অবস্থানস্থলের সব জিনিসপত্র হস্তগত করার পর মুসলমানরা পরিখা পার হয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) আবজারের কাছাকাছি পৌঁছে যান কিন্তু আবজারের ঘোড়া হযরত কায়েস (রা.)-এর ঘোড়ার চেয়ে শক্তিশালী ছিল। তখন তিনি ভাবেন, সে না আবার আমার হাতছাড়া হয়। তিনি (রা.) আবজারের ঘোড়ার পিঠে বর্শা নিক্ষেপ করলে ঘোড়া আহত হয়। যাহোক, বর্ণিত রয়েছে যে, আবজার পলায়ন করতে সক্ষম হয় এবং তাঁর হাতে ধরা পড়ে নি।অপর একটি বর্ণনায় আছে, হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) আবজারের মাথায় কোপ মারেন, ফলে সেটি তার হেলমেট ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এরপর হযরত কায়েস (রা.) পুনরায় এমন আঘাত করেন যে, সে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮-২৮৯)) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৭) (কিতাবুর রাদ্দা লিল ওয়াকদি, পৃ:১৬৩)

প্রভাতে হযরত আ’লা (রা.) গণিমতের মাল যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করে দেন এবং যারা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এমন লোকদেরকে নিহত সর্দারদের মূল্যবান পোষাকও দিয়ে দেন। তাদের মাঝে হযরত আফীফ বিন মুনযের (রা.), হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) এবং হযরত সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে (বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ) মূল্যবান পোষাক প্রদান করা হয়।হযরত সুমামা (রা.)-কে যে পোশাক দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে হুতু মের একটি নকশাকৃত কালো মূল্যবান আলখেল্লা ছিল যেটি পরে সে খুব গর্বসহকারে সাথে চলাফেরা করত।

(তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৯)

এই অভিযানের সফলতার বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-কে অবগত করা হয়। হযরত আ’লা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে একটি পত্রের মাধ্যমে পরিখাবাসীর পরাজয় এবং হুতুমকে হত্যা করার সংবাদ প্রদান করেন, যাকে যায়েদ (রা.) ও মুআম্মার (রা.) হত্যা করেছিলেন। তিনি পত্রে লিখেন- পরসমাচার, অতীব পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ আমাদের শত্রুদের চেতনাশক্তি প্রত্যাহার করে নেন। তাদের শক্তিসামর্থ্যকে সেই মদের কারণে বিলুপ্ত করেন যা তারা দিনের বেলায় পান করেছিল। আমরা পরিখা অতিক্রম করে তাদের মাঝে প্রবেশ করি এবং তাদেরকে মাতাল দেখতে পাই। দু-একজন বাদে বাকি সবাইকে আমরা হত্যা করেছি। আল্লাহ্ তা’লা হুতুমের ভবলীলাও সাঙ্গ করেছেন

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯০-২৯১))

হাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকা হযরত আ’লা (রা.) হস্তগত করেছেন। কিন্তু অনেক স্থানীয় পারসিক নতুন এই সরকারের বিরোধীতা অব্যাহত রেখেছে। তারা প্রায়শ লোকদের মাঝে এই সংবাদ প্রচার করে ভীতি সঞ্চার করছে যে, স্বল্প সময়ের ভেতর হাজর-এ মদীনা সরকারের পতন ঘটবে। মাফরুক শেবানী নিজ জাতি তাগলিব ও নামির সমন্বয়ে বাহিনী নিয়ে

আসছে। হযরত আবু বকর (রা.) এই সংবাদ জানতে পেরে হযরত আ'লা (রা.)-কে লিখেন, অনুসন্ধানে যদি প্রমাণ হয় যে, বনূ শায়বান বিন সালেবার নেতা মাফরুক তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে এবং নৈরাজ্যবাদীরা এ সংবাদ ছড়াচ্ছে তবে তাদেরকে হত্যা করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে আর তাদেরকে পিষে ফেলবে এবং তাদের অনুগামী গোত্রগুলোকে এমন ভীতবিহ্বল করবে যেন তারা কখনো মাথা চাড়া দেওয়ার দুঃসাহস না দেখাতে পারে।

(হযরত আবু বাকার (রা.) কে সরকারি খুতুত, পৃ: ৪৯) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৯১)

মুরতাদরা দারীনে এসে একত্রিত হয়।

এ সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেন, দারীনের যুদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক দারীনের যুদ্ধ হযরত উমর (রা.)-এর যুগে হয়েছে বলে লিখেছেন। যাহোক, মুরতাদরা এখানে একত্রিত হয়।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫) (ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ১১৭)

দারীন পারস্য উপসাগরের একটি দ্বীপ ছিল যা কয়েক মাইল দূরে বাহরাইনের বিপরীত দিকে অবস্থিত। সেখানে প্রথম থেকেই খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল। হযরত আ'লা (রা.)-এর নিকট পরাজিত হবার পর বেঁচে যাওয়া পরাজিত বিদ্রোহীদের একটি বৃহৎ অংশ নৌকায় চড়ে দারীনে চলে যায় এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। হযরত আ'লা বিন হাযরামী(রা.) বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য করে লিখেন, তাদের মোকাবিলা কর। এমনকি হযরত উতায়বা বিন নাহাস এবং হযরত আমের বিন্ আব্দু ল আসওয়াদকে নির্দেশ দেন, তোমরা যেখানেই আছ সেখানেই অবস্থান কর আর প্রতিটি রাস্তায় মু রতাদদের মোকাবিলা করার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত কর। এছাড়া তিনি হযরত মিসমাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন সামনে অগ্রসর হয়ে মুরতাদদের মোকাবিলা করেন। আবার তিনি হযরত খাসাফা তায়মী এবং হযরত মুসান্না' বিন হারসা শায়বানীকে নির্দেশ দেন, তারাও যেনমু রতাদদের মোকাবিলা করেন। বাহরাইনে মুরতাদ সৃষ্ট বিদ্রোহের আগুন নিভানোর কাজে মুসান্না বিন হারেসা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে হযরত আ'লা বিন হাযরামি (রা.)-এর সাথে যোগ দেন এবং বাহরাইনের উত্তর দিকে রওয়ানা হন। তিনি কাতীফ এবং হাজর দখল করেন। নিজের মিশন তিনি অব্যাহত রাখেন এবং সেসব পারস্য সেনাবাহিনী ও তাদের নিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন যারা বাহরাইনের মুরতাদদের সাহায্য করেছিল। মু রতাদদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি হযরত আ'লা বিন হাযরামী (রা.)-এর সাথে যোগ দেন যেসব অঞ্চলের মানুষ ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপকূলীয় অঞ্চল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত মুসান্না বিন হারেসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন হযরত কায়েস বিন আসেম (রা.) বলেন, তিনি কোন অপরিচিত, অজাতকুলশীল অভদ্র কোন মানুষ নন বরং তিনি হলেন মুসান্না বিন হারসা শে'বানী (রা.)। অতএব হযরত মুসান্না বিন হারসা শে'বানী(রা.) মুরতাদদের প্রতিহত করার জন্য রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে যান। মু রতাদদের মধ্যে কেউ কেউ তওবা করে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাদের (তওবা ও বয়আত) গ্রহণ করা হয়। আবার কতক তওবা করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং অস্বীকারের ওপর অটল থাকে, তাই তাদেরকে নিজ এলাকায় ফেরত যেতে দেওয়া হয় নি।তাই তারা সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করে যেদিক থেকে তারা এসেছিল এমনকি তারাও নৌকাযোগে দারীন পৌঁছে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলকে এক স্থানে একত্রিত করে দেন। হযরত আ'লা (রা.) তখনো মুশরেকদের সেনাবাহিনীতে অবস্থান করছিলেন, ইতোমধ্যে তিনি বকর বিন ওয়ায়েলকে যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তর প্রাপ্ত হন এবং জানতে পারেন, তারা আল্লাহ্ তা'লার আদেশের ওপর আমল করবে এবং তার ধর্মের সমর্থন করবে। হযরত আ'লা (রা.) যখন তাদের সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তারা মুসলমান আর তারা বিদ্রোহ করছে না এবং যুদ্ধ করবে না এবং যখন তঁ ার [অর্থাৎ হযরত আ'লা (রা.)-এর] এই বিশ্বাস জন্মালো যে তাদের যাওয়ার পর বাহরাইনের অধিবাসিদের কারো সাথে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না। তখন তিনি (রা.) বলেন, 'এখন সকল মুসলমানকে দারীনের দিকে যাত্রা করা উচিত' এবং তিনি (রা.) তাদেরকে দারীন অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে । এই ঘটনাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেটিকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয় যে, কীভাবে তারা সমুদ্রকে অতিক্রম করেছে। এই ঘটনার বর্ণনায় কিছুটা সত্যতা থাকতে পার অথবা হতে পারে অতিরঞ্জিতও করা হয়েছে। যাহোক এতে যদি কিছুটা সত্য থাকে তাহলে তার ব্যাখ্যা আমি শেষের দিকে তুলে ধরবো। যাহোক বলা হয়ে থাকে যে, মুসলমানদের নিকট নৌকা বা জাহাজ ইত্যাদি ছিল না যাতে আরোহন করে তারা দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতো। এই অবস্থা দেখে হযরত আ'লা বিন হাযরামি (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের একত্রিত করে তাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন। বক্তৃতায় তিনি (রা.) বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য শয়তানের দলকে একত্রিত করে দিয়েছেন এবং যুদ্ধকে সমুদ্রে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি প্রথমে স্থলে তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়েছেন যেন সেই নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তোমরা সমুদ্রপথেও শিক্ষা লাভ করতে পার। নিজ শত্রুর দিকে অগ্রসর হও, সমুদ্রের বুক চিরে তাদের দিকে অগ্রসর হও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্যই তাদেরকে একত্রিত করেছেন।

তারা সমস্বরে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমরা এমনটাই করবো আর দাহ্না উপত্যকার মোজেযা প্রত্যক্ষ করার পর আমরা যতদিন জীবিত থাকবো তাদেরকে ভয় করবো না। তাবারীতে এই রেওয়ায়াতটি লিখিত আছে। সেই মোজেযা যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, অর্থাৎ, মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া উটগুলোও ফিরে এসেছিল এবং পানির ঝর্ণা প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে তারা বলে যে আমরা সেই নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করেছি তাই সমুদ্রপথে যাত্রার নিদর্শনও আমরা প্রত্যক্ষ করবো। হযরত আ'লা (রা.) এবং সকল মুসলমান সেই স্থান থেকে যাত্রা করে সমুদ্রের কিনারায় এসে উপস্থিত হন। হযরত আ'লা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই দোয়া করছিলেন যে "হে সবচেয়ে, হে পরম বদান্যশীল, হে পরম সহনশীল, হে এক অদ্বিতীয়, হে অমুখাপেক্ষী, হে চিরঞ্জীব ও জীবনদানকারী, হে মৃতকে জীবনদানকারী, হে চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা তুমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, হে আমাদের প্রভু!

যাহোক বর্ণনা করা হয় যে, হযরত আ'লা (রা.) সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে বললেন 'এই দোয়া করতে করতে নিজেদের বাহন সমুদ্রে নামিয়ে দাও'। সুতরাং সকল মুসলমান নিজেদের সেনাপতি হযরত আ'লা বিন হাযরামির অনুসরণে তাদের ঘোড়া, গাধা, উট ও খচ্চরের ওপর আরোহন করে সেগুলোকে তার পেছনে সমুদ্রের মধ্যে নামিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'লার কুদরতে তারা সেই উপসাগর কোন রকম কোন ক্ষতি ছাড়াই অতিক্রম করে। এমন মনে হচ্ছিল যে সেখানে তারা নরম বালির ওপর চলছে যাতে পানি ফেলা হয়েছে। তাদের উটের পা পর্যন্ত ডুবে নি আর সমুদ্রে মুসলমানদের কোন জিনিসও হারায় নি। ছোট্ট একটি পুটলি হারানোর উল্লেখ পাওয়া যায় তাও হযরত আলা (রা.) তুলে এনেছিলেন। যাহোক, সমুদ্র সৈকত থেকে দারাইন পর্যন্ত সফরের বর্ণনা করা হয় যে, নৌকায় চেপে এক দিন এবং এক রাতে এই পথ পাড়ি দিতে হতো, কিন্তু এই কাফেলা এক দিনের খুব অল্প সময়েই এই দূরত্ব অতিক্রম করে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮-২৮৯) (হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২৪১-২৪২)

তাবারির ইতিহাসগ্রন্থে এর ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু বতর্মান যুগের কোন কোন লেখক এর ব্যাখ্যাও লিখেন অর্থাৎ, তারা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, সম্ভবতঃ পারস্য উপসাগরে তখন ভাটা এসে থাকবে অথবা রেওয়ায়েতে বাড়াবাড়ি থাকবে; আর প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে মুসলমানরা নৌকা পেয়ে গিয়ে থাকবেন যাতে আরোহণ করে তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে থাকবেন। কিন্তু যাহোক, কোন রেওয়ায়েতেই এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মানুষ এসব রেওয়ায়েত লিখেছেন, তারা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরা দারীন পৌঁছে গিয়েছিলেন।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়াত অউর কারনামে, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ:২৪২)

কীভাবে পৌঁছে ছিলেন তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। বাকি রইল বিভিন্ন মু'জিযা (বা অলৌকিক নির্দশনের) বিষয়টি। (এ সম্পর্কে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক তফসীরে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে যে নীতিগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা উপস্থাপন করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কুরআন শরীফে বর্ণিত হযরত মূসা (আ.) -এর হিজরতকালে সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,"পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এটি মনে হয় যে, বনী ইস্রাঈল পবিত্র ভূমিতে (গমনের) সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছিল; তাদের পশ্চাতে

ফেরাউনের সেনাদল এসে উপস্থিত হয়। তাদের দেখে বনী ইস্রাঈল বিচলিত হয়ে পড়ে আর মনে করে যে, এখন ধরা পড়ে যাব; কিন্তু খোদা তা'লা হযরত মূসা (আ.) –এর মাধ্যমে তাদের আশ্বস্ত করেন। আর হযরত মূসাকে বলেন, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রপৃষ্ঠে আঘাত কর; যার ফলে সমুদ্রের (মাঝে) একটি রাস্তা (দৃশ্যমান) হয় আর সেই পথ দিয়ে তারা সম্মুখে অগ্রসর হন। তাদের দু'ধারেই পানি ছিল যা বালুর টিলা সদৃশ অর্থাৎ, উঁচু দেখা যাচ্ছিল। ফেরাউনের সেনাদল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে কিন্তু বনী ইস্রাঈলের নিরাপদে পাড়ি দেওয়ার পর পুনরায় পানি বৃদ্ধি পায়; আর মিশরীয়রা নিমজ্জিত হয়। তিনি লিখেন, এই ঘটনাটি বুঝতে হলে একথা মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সকল মু'জেযা (তথা অলৌকিক নিদর্শন) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেখানো হয়। কোন মানুষের এতে হাত ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অতএব, হযরত মূসা (আ.)–এর লাঠি (হাতে) তুলে নেওয়া এবং (তা দিয়ে) সমুদ্র বক্ষে আঘাত করা কেবল–ই এক নিদর্শনের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল; এমন নয় যে, হযরত মূসা (আ.)–এর এই লাঠির সমুদ্র ছোট হয়ে যাওয়ায় কোন ভূমিকা ছিল।

একইভাবে এটিও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী দ্বারা কখনোই প্রমাণিত হয় না যে, সমুদ্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর হযরত মূসা (আ.) সেই পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। বরং পবিত্র কুরআনে এই ঘটনা সম্পর্কে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমতঃ ফারাকা দ্বিতীয়তঃ ইনফালাকা, যার অর্থ আলাদা হয়ে যাওয়া। কাজেই, পবিত্র কুরআনের শব্দাবলী অনুযায়ী এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ যা সামনে আসে তাহলো, বনী ইস্রাঈলের অতিক্রম করার সময় সমুদ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ, (জলরাশি) সমুদ্রতীর থেকে সরে গিয়েছিল এবং জেগে ওঠা স্থল থেকে বনী ইস্রাঈলীরা (পথ) পাড়ি দিয়েছিল আর সাগর তীরে বা সমুদ্র সৈকতে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে।

যেমন নেপোলিয়নের জীবনচরিতেও লেখা আছে যে, মিশরের ওপর আক্রমনকালে সেও তার সেনাবাহিনীর একটি অংশসহ লোহিত সাগরের তীর দিয়ে ভাটার সময় অতিক্রম করেছিল আর তার (পথ) পাড়ি দিতে দিতে জোয়ারের সময় হয়ে যায় আর বড় কষ্টে প্রাণে বাঁচেন। এই ঘটনায় অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) –এর ঘটনায় যেমু'জিযা ছিল তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা বনী ইস্রাঈলকে এমন সময় সমুদ্র তীরে পৌঁছিয়েছিলেন যখন ভাটার সময় ছিল আর হযরত মূসা (আ.)–এর হাত তুলতেই ঐশী নির্দেশ অনুযায়ী সমুদ্রের পানি হ্রাস পেতে থাকে, কিন্তু ফেরাউনের সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নামে তখন এমন অসাধারণ বাঁধা তাদের পথে সৃষ্টি হয় যে, তার বাহিনী অতিমন্থর গতিতে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে ফলে (তাদের) সমুদ্রে থাকা অবস্থাতেই জোয়ার চলে আসে আর শত্রুরা নিমজ্জিত হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাটা হতেই থাকে আর এক সময়ে পানি তীর থেকে নীচে অনেক দূরে নেমে যায় আবার আরেক সময়ে তা স্থলে অনেক দূর ভেতরে এসে যায় ।

সমুদ্র বিভক্ত হওয়ার ঘটনা এই জোয়ার–ভাটার অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত মূসা (আ.) এমন সময়ে সমুদ্র পাড়ি দেন যখন ভাটার সময় ছিল আর সমুদ্রের পানি নীচে নেমে গিয়েছিল, আর এর পর ফেরাউন পৌঁছায়। আর এর কারণ হল, সে কমপক্ষে হযরত মূসা (আ.)–এর একদিন পর রওয়ানা হয়েছিল, সে (পরিমরি করে) ছুটতে ছুটতে যখন সমুদ্রের কাছে পৌঁছে তখন হযরত মূসা (আ.) সমুদ্রের যে–ই জলশূণ্য স্থান অতিক্রম করছিলেন তার অধিকাংশ পাড়ি দিয়ে ফেলেছিলেন। ফেরাউন তাঁকে (সমুদ্র) পাড়ি দিতে দেখে ত্বড়িৎ নিজের রথ তাতে নামিয়ে দেয়, কিন্তু সমুদ্রের বালি ভেজা ছিল যা তার রথগুলোর জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়। তার রথগুলো তাতে আটকে যেতে আরম্ভ করে আর এতটাই বিলম্ব হয়ে যায় যে, জোয়ারের সময় হয়ে যায় আর পানি বাড়তে আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় তার জন্য দু'টি পথই কঠিন ছিল। সে সামনেও যেতে পারছিল না আর না–ই পেছনে। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, সমুদ্র তাকে মাঝপথেই ঘিরে ফেলে আর সে এবং তার অনেক সাঙ্গপাঙ্গ সমুদ্রে নিমজ্জিত ডুবে যায়। আর যেহেতু জোয়ারের সময় ছিল, সমুদ্রের পানি যেহেতু তীরমুখী বেড়েই চলছিল (তাই) সেই পানি তাদের শবদেহগুলোকে ডাঙ্গায় স্থানে (ভাসিয়ে) নিয়ে আসে।

(তফসীর কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১৯–৪২২)

যাহোক, যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, মুসলমানরা কোন ভাবে দারীনে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানেও হয়তো এমন কোন ঘটনাই ঘটে থাকবে অর্থাৎ, জোয়ার–ভাটার (ঘটনা)।

দারীনে পৌঁছার পর সেখানে বিদ্রোহী মুরতাদদের সাথে মুসলমানদের মোকাবিলা বা সংঘর্ষ হয় আর চরম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে তারা অর্থাৎ; বিদ্রোহীরা মারা যায়। সংবাদ দেওয়ার মতোও কেউ রক্ষা পায়নি। মুসলমানরা তাদের পরিবারবর্গকে দাস–দাসী বানিয়ে নেয় এবং তাদের ধন–সম্পদ করতলগত করে। প্রত্যেক অশ্বারোহী (সৈনিক) মালে গণিমত হিসেবে ছয় হাজার এবং প্রত্যেক পদাতিক (সৈনিক) দু'হাজার দিরহাম করে লাভ করে। সমুদ্রতীর থেকে তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করতে মুসলমানদের পুরো দিন লেগে যায়, তাদের দমন করে তারা ফেরত চলে আসে।

হযরত সুমামা বিন উসাল (রা.)'র শাহাদতের ঘটনায় লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, হযরত আলা বিন হাযরামী (রা.) সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন শুধুমাত্র তাদের ব্যতীত যারা সেখানেই অবস্থান করা পছন্দ করেছেন। হযরত সুমামা বিন উসালও প্রত্যাবর্তনকারীদের একজন ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন হাযফ বলেন, আমরা বনু কায়েস বিন সা'লেবার একটি ঝরনার পাশে অবস্থান করছিলাম। লোকজনের দৃষ্টি হযরত সুমামার প্রতি নিবদ্ধ হয় আর তারা তার গায়ে হুতুমের আলখাল্লা পরিহিত দেখতে পায়। এটি হুতুমের সেই আলখাল্লা ছিল যা তার নিহত হওয়ার পর মালে গণিমত হিসেবে হযরত সুমামাকে দেওয়া হয়েছিল। তারা একজনকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করে। অর্থাৎ, সেই গোত্রের লোকেরা তাকে বলল, গিয়ে হযরত সুমামাকে জিজ্ঞাসা কর যে, এই আলখাল্লা তুমি কোথায়পেলে? আর হুতুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর যে, তুমিই কি তাকে হত্যা করেছ; না–কি অন্য কেউ? হুতুম তাদের নেতা ছিল। সেই ব্যক্তি এসে হযরত সুমামাকে জোব্বা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, এটি আমি মালে গণিমত হিসেবে পেয়েছি। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, হুতুমকে কি তুমি হত্যা করেছ? হযরত সুমামা বলেন, না। যদিও আমার তাকে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, (তাহলে) এই জোব্বা তোমার কাছে কোত্থেকে এলো? হযরত সুমামা বলেন, এর উত্তর আমি তোমাকে পূর্বেই দিয়েছি যে, মালে গণিমত হিসেবে পেয়েছি। তখন সেই গোত্রের ঐ ব্যক্তি তার বন্ধুদেরকে এসে পুরো আলোচনা সম্পর্কে অবগত করে। তারা তখন সবাই একত্রিত হয়ে হযরত সুমামার কাছে আসে এবং তাকে ঘিরে ফেলে।তারা সবাই বলে, আপনি হুতমের হত্যাকারী। হযরত সুমামা (রা.) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলছ, আমি তার হত্যাকারী নই। অবশ্য এ আলখাল্লাটি আমি গনিমতের মালের অংশ হিসেবে পেয়েছি। তখন তারা বলে, অংশ তো কেবল হত্যাকারীই পায়। হযরত সুমামা (রা.) বলেন, এ আলখাল্লাটি তার গায়ে ছিল না বরং তার বাহন কিংবা তার মালপত্র থেকে পাওয়া গেছে। একথা শুনে লোকেরা বলে, তুমি মিথ্যা বলছ। এরপর তারা তাকে শহীদ করে ফেলে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৯–২৯০)

দশম অভিযান সম্পর্কে লিখা রয়েছে: এটি হযরত সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.) –এর নেতৃত্বে মুরতাদ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) একটি পতাকা হযরত সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.)–কে দেয়ার পর নির্দেশ দেন, তিনি যেন ইয়ামেনের অঞ্চল তিহামায় যান।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

তিহামা: অভিধানে তিহামা শব্দের অর্থ হল প্রচণ্ড গরম এবং বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। অনুরূপভাবে অভিধানে এর আরেকটি অর্থ নিচু জমি বা নিম্নভূমি। (লিসানুল আরব)

ইয়ামেনের পশ্চিম দক্ষিণে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত নিম্নভূমির একটি অঞ্চল রয়েছে যাকে তিহামা বলা হয়। তিহামার উত্তরসীমান্ত প্রায় মক্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দক্ষিণ ইয়ামেনের রাজধানী সানা থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ মাইল দূরে শেষ হত। তিহামা ইয়ামেনের একটি জেলা ছিল যাতে অনেকগুলো গ্রাম এবং ছোট ছোট শহর ছিল।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, পৃ: ৪০–৪১)

এই হলো ইয়ামেনের তিহামার পরিচিতি।

হযরত সুওয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.)–এর পরিচয় হল: হযরত সুওয়ায়েদ (রা.)–এর পিতার নাম ছিল মুকাররিন বিন আয়েজ। তিনি বাযায়না গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার ডাক নাম ছিল আবু আদী, (কোথাও আবার) তার ডাক নাম আবু আমর বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৫ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খন্দক বা পরিখার যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)–এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন আর এরপর অন্য সব যুদ্ধেই তিনি মহানবী (সা.)–এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত নো'মান বিন মুকাররিন (রা.) –এর ভাই ছিলেন, পারস্য বিজয়ের ক্ষেত্রে যিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন।

(উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০০) (তাবাকাতুল কুবরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯৭)

হযরত সুওয়ায়েদ (রা.)–এর তিহামা যাওয়ার এবং সেখানে মুরতাদদের বিরুদ্ধে তার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না। তবে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তিহামার অধিবাসীদের ধর্মত্যাগ এবং

বিদ্রোহের অবস্থা ও বিভিন্ন ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) ১০ হিজরী সনে বিদায় হজ্জের পর ইয়ামেনে কয়েকজন যাকাত সংগ্রহকারী নিয়োগ দেন। তিনি (সা.) ইয়ামেনকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তিহামায় তাহের বিন আবু হালাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

তিহামায় নিম্নশ্রেণীর আরব ছাড়াও দুটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল। একটি আক এবং অন্যটি আশআর।

(হযরত আবু বাকার কে সরকারি খুতুত, পৃ: ৪১)

তবারীর ইতিহাসগ্রন্থে লিখা রয়েছে, সর্বপ্রথম হযরত ইতাব বিন আসীদ এবং হযরত উসমান বিন আবুল আস (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে লিখেন, আমাদের অঞ্চলে মুরতাদরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসেছে।

মুরতাদরা কেবল মুরতাদ ছিল না, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণও করত। এখানেও একই অবস্থা বিরজ করছিল। হযরত ইতাব (রা.) তার ভাই হযরত খালেদ বিন আসীদ (রা.)-কে তিহামাবাসীর দমনের জন্য প্রেরণ করেন। যেখানে বনু মুদলেজের একটি বড় দল এবং খুযা ও কেনানার বিভিন্ন দল বনু মুদলেজের বনু শনুব বংশের জন্দুব বিন সালমার নেতৃত্বে মুরতাদ হয়ে মোকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছিল। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয় আর হযরত খালেদ বিন আসীদ (রা.) তাদেরকে পরাজিত করে ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং অনেক লোককে হত্যা করেন। এতে বনু শনুব গোত্রের লোক সবচেয়ে বেশি মারা পড়ে। এ ঘটনার পর তাদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি হযরত ইতাব (রা.)-এর অঞ্চলকে ধর্মত্যাগীদের নৈরাজ্য থেকে পবিত্র করে আর জন্দুব পালিয়ে যায় এবং কিছু দিন পর সে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩০)

একটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তিহামায় সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহ করে আক ও আশআর গোত্র। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন লোক একত্রিত হয় এবং খাযম গোত্রের লোকেরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা উপকূলীয় আ'লাব নামক স্থানে শিবির করে এবং তাদের সাথে সেই সৈন্যরাও এসে যোগ দেয় যাদের কোন নেতা ছিল না। আ'লাবও মক্কা এবং সমুদ্র উপকূলের মধ্যবর্তী আক গোত্রের অঞ্চল। হযরত তাহের বিন আবু হালা হযরত আবু বকর (রা.)-কে এ সংবাদ প্রদান করেন এবং নিজেই তাদেরকে দমন করার জন্য যাত্রা করেন আর নিজের যাত্রা করার সংবাদও তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখে জানিয়ে দেন। হযরত তাহেরের সাথে মাসরূক আক্কী এবং আক গোত্রের সেসব সদস্য ছিলেন যারা মুরতাদ হন নি। এভাবে তারা আ'লাব গিয়ে তাদের মুখোমুখি হন এবং সেখানে তাদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদেরকে পরাজিত করেন। মুসলমানরা তাদেরকে নির্দ্বিধায় হত্যা করেন। পুরো রাস্তায় নিহত শত্রুদের (লাশের) দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা এক মহান বিজয় লাভ করেন।

তিহামায় ধর্মত্যাগের ঘটনাবলীর উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, তিহামার মুরতাদদের দমনের তালিকায় শীর্ষে ছিলেন তাহের বিন আবু হালা, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে তিহামা অঞ্চলের গভর্ণরহিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যা আক ও আশআর গোত্রের লোকদের বসতিস্থল ছিল। পরবর্তীতে আবু বকর (রা.) উকাশা বিন সওরকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তিহামায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের একত্র করে তাঁরনির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেন। হযরত উকাশা মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় হাযার মওতের দুটি অঞ্চল সাকাসিক ও সুকুনের কর্মকর্তা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বাজীলা গোত্রের কাছে জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ বাজালীকে ফেরত পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন ইসলামের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিজ জাতির মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগকারী মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেন আর এরপর খাসম গোত্রের কাছে যান এবং তাদের মুরতাদদের সাথেও যুদ্ধ করেন। জারীর নিজ অভিযানে রওয়ানা হয়ে যান এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পালন করেন। অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া আর কেউই তার বিরুদ্ধে লড়তে আসে নি; তিনি তাদের হত্যা করেন ও ছত্রভঙ্গ করে দেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৪-২৯৫) (আল কামিলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩০) (সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসিয়্যত অউর কারনামে, ডক্টর-আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ৩০৩) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৩)

এগুলো যুদ্ধাভিযানের বর্ণনা চলছে, পরবর্তীতে একাদশ অভিযান বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। তাদের মধ্যে দুজন হলেন বুর্কিনাফাসো নিবাসী আমাদের দুই যুবক। গত ১১ জুন সন্ধ্যায় তারা তাদের ডোরি রিজিওনের একটি গ্রামে ছিলেন যেখানে জঙ্গীরা আক্রমণ করে আর অনেক মানুষ এখানে নিহত হয়, তাদের মধ্যে আমাদের এই দু 'জন আহমদী খাদেমও শহীদ হন যারা তখন তাদের দোকানে কাজ করছিলেন। (তাদের ওপর) গুলিবর্ষণ করা হয় এবং ঘটনাস্থলেই তারা শহীদ হন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** তাদের মধ্যে একজনের নাম হল ডিকো যাকারিয়া, তার বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। তিনি ডোরি রিজিওনের খোদ্দামুল আহমদীয়ার রিজিওনাল কায়েদ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ঘানার মাদ্রাসাতুল হিফয-এ কুরআন শরীফ হিফয করতেও গিয়েছিলেন, কিছুদিন হিফয করার পর ফেরত চলে আসেন। জামা'তের সেবায় সদাপ্রস্তুত থাকতেন, প্রত্যেক কাজের জন্য 'লাব্বায়েক' বলে নিজেকে উপস্থাপন করতেন। পাঁচবেলার নামায নিয়মিত পড়তেন, তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযও নিয়মিত পড়তেন, নিজের বিভিন্ন চাঁদাও নিয়মিত প্রদান করতেন। নিয়মিত মাসিক আয় ছাড়াও যদি কোন আয় হতো তবে সেটির চাঁদাও তৎক্ষণাৎ প্রদান করতেন। জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ছিল, নিয়মিত জুমু'আর খুতবা শুনতেন; এমটিএ-র অন্যান্য অনুষ্ঠানও খুব আগ্রহের সাথে দেখতেন। সেখানকার স্থানীয় মোবাল্লেগ বলেন, তার সাথে সর্ব শেষ যখন দেখা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতের গভীর বাসনা ছিল তার। (সর্বদা ভাবতেন), কবে যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হবে। মোয়াল্লেম সাহেব লিখেছেন, তিনি একজন আদর্শ খাদেম ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় শহীদ ছিলেন ওডিকো মূসা সাহেব। তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সাইতিনগার-এর কায়েদ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। নিজ জামা'তের সব অনুষ্ঠানেই সবার চেয়ে বেশি অংশ নিতেন এবং অন্যদের অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামায পড়তেন ও চাঁদা দিতেন। তার জামা'তে মসজিদ ছিল না। তাই তিনি স্থানীয়ভাবে চেষ্টা করছিলেন যাতে একটি ছাউনি দিয়ে সেখানে নিয়মিত নামায পড়া যায়। তিনি আমাকে নিয়মিত চিঠিও লিখতেন। রাজধানী থেকে কেউ সফরে গেলে তাদের আন্তরিকতার সাথে আতিথেয়তা করতেন। নিজে সাথে থেকে কাজ করাতেন এবং সফরে অংশ নিতেন। তিনিও তাঁর অবর্তমানে দুজন স্ত্রী এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

এই দুই শহীদ সম্পর্কে সেই জামা'তের আমীর লিখেন, এ দু 'জন খাদেমই আমাদের স্থানীয় মোবাল্লেগ ডিকো আহমদ বোরিমা সাহেবের ভাই ছিলেন। যিনি বর্তমানে রেডিও আহমদীয়া ডোরির ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের পিতা ইব্রাহীম বুনতি সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং উদ্যমী দাঈআনে ইলাল্লাহ্ ছিলেন। তিনি ডোরি রিজিওনের আনসারুল্লাহ্র যয়ীমও ছিলেন। ২০১১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর আমীর সাহেব দোয়ার আবেদন করে লিখেন, ২০১৫ সাল থেকে বুরকিনাফাসোতে সন্ত্রাসী হামলা চলছে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে তারা অনেক ধ্বংসাযজ্ঞ চালাচ্ছে। ২০ লাখের বেশি মানুষ ইতোমধ্যে গৃহহীন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল করুন। পৃথিবীতে এখন যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে এধরনে সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির প্রতিঅনুগ্রহ করুন এবং তাদের সুবুদ্ধির উদয় হোক।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হচ্ছে জনাব নুরাম খান সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ ইউসুফ বেলুচ সাহেবের। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের উমরকোট জেলার ওসতী সাদেকপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তিনি বেলুচ জাতি গোষ্ঠীর সদস্য ডেরা গাজী খান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সনে হযরত গোলাম রসূল রাযেকী সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত আসে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা হিজরত করে সাদেকপুর উমর কোটের তাহরীকে জাদীদের জমিতে চলে আসেন। পরবর্তীতে তিনি প্রায় ৬ বছর রাবওয়াতেও অবস্থান করেন এবং এই পাড়ার মসজিদে খাদেম হিসেবে সেবা করারও সৌভাগ্য পেয়েছেন। আল্লাহ্র কৃপায় তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। নিজ অবর্তমানে তিনি তার স্ত্রী ছাড়াও সাত পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন।

তার এক পুত্র সাব্বির আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে বর্তমানে আইভোরি কোস্টে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি নিজ পিতার জানাযা য় অংশ নিতে পারেন নি। মরহুমের দুই পৌত্র মুরব্বী সিলসিলাহ্।

তার পুত্র সাব্বির আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্ লিখেন, আমার পিতা বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। শৈশব থেকেই আমরা তঁ াকে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তে দেখেছি। প্রতিদিন ফযরের নামাযের পর উঁচু স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। তিনি বলেন, যখনই আমি বাড়ি যেতাম আমাকে ডেকে বলতেন, আমার দুটি কথা সর্বদা মনে রাখবে। সর্বদা খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং নিজ ওয়াকফের দাবি পূর্ণ করবে। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। পথচারীদেরও ঘরে নিয়ে আসতেন। তার মৃত্যুতে অনেক অ-আহমদী এবং হিন্দুরাও সমবেদনা জানাতে এসেছেন আর সবাই তার প্রশংসা করেছেন এবং এটিও বলেছে যে, আমাদের পিতা মৃত্যু বরণ করেছেন, কেননা তিনি দরিদ্রদের অনেক সাহায্য করতেন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ রাবওয়া নিবাসী ওয়াকফে নও স্নেহের মুবারেযা ফারুকের, যিনি ফারুক আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেছে, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** এই মেয়ে যখন এগারো বছর বয়সের ছিল তখন বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ তারে হাত লাগার কারণে তার দুই হাতই অকেজো হয়ে যায় এবং উভয় হাত কেটে ফেলতে হয়। কিন্তু সে অবস্থাতেও স্নেহের এই মেয়ে মনোবল হারায় নি নি। সে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যায়। প্রথমে সে মুখ দিয়ে কলম ধরে লেখার অনুশীলন করে। এরপর দুই কনুই দিয়ে কলম ধরে লেখার অনুশীলন করে। আর এভাবে কয়েক মাসেই খুব সুন্দর লেখা শিখে যায়। পাশাপাশি লেখাপড়াও চালিয়ে যায়। কিছুদিন পর তার পরিবার রাবওয়া চলে আসে। এখানেও নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকে। ২০১৩ সালে ভালো নম্বারে বি.এ. সম্পন্ন করেন। এরপর তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে আরব ীতে এম.এ. সম্পন্ন করেন। ওয়াকেফায়ে নও হিসেবে তিনি কিছুদিন তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ সেবা করে। কুরআন করীম শুদ্ধ উচ্চারণে এবং শাব্দিক অনুবাদসহ শিখেন এবং সবসময় শতভাগ নম্বর পেতেন। পাড়ায় কুরআন অনুবাদের ক্লাসও নিতেন। তার অবর্তমানে তিনি পরিবারে পিতামাতা ছাড়াও দুই ভাই এবং দুই বোন রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার পিতামাতাকেও ধৈর্য্য ও মনোবল দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মোকাররম আঞ্জুমানা বাতারা সাহেবের, যিনি আইভোরিকোস্টে, মাসাদোগো এলাকায় জামা'তের মুয়াল্লেম ছিলেন। তিনিও কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।*** সেখানকার মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, মরহুম সহজ-সরল, নামায রোযায় নিয়মিত, বিনয়ী, দোয়ায় অভ্যস্ত, পুণ্যবান ও পবিত্র প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। অনেক বেশি নফল নামায পড়তেন এবং সোমবার ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত নফল রোযা রাখতেন। তার দোয়াও ব্যাপকভাবে কবুল হতো। খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। একজন সর্বোত্তম মুবাল্লেগ ছিলেন। ১৯৯৭ সালে এক স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন আর স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, তিনি একটি জঙ্গালে রয়েছেন এবং সেখান থেকে নাসিয়া নামক একটি গ্রামে যাচ্ছেন। সেখানে যাওয়ার জন্য তিনি একটি তরবারি দিয়ে রাস্তা প্রস্তুত করছেন এবং একইসাথে উচ্চস্বরে কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করছেন। তিনি বলেন, এই স্বপ্নের পর একদিন আমি জানতে পারি যে, উমর মুআয সাহেব নামের একজন আহমদী মুবাল্লেগ তবলীগের উদ্দেশ্যে নাসিয়া এসেছেন। এটি শুনে তিনি নিজেও নাসিয়া যান আর জামা'তের বাণী শুনতেই বয়আতকরে নেন এবং বলেন যে, এটিই ছিল সেই বাণী যা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে আমাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ, চেষ্টা করে আমাকে সেই গ্রামে যেতে হবে যেখানে আমি (প্রকৃত) ধর্মের সন্ধান পাব। যাহোক, আহমদীয়াত গ্রহণের কিছুদিন পর তিনি রীতিমতো জামা'তের মুয়াল্লেম হিসেবে জীবন উৎসর্গ করেন। জামা'তের সেবা আরম্ভ করেন। ২০০২ সালে যখন দেশে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন কেন্দ্রের সাথে তার এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মুয়াল্লেম সাহেব তার গ্রাম এবং আশেপাশের জামা'তগুলোর সাথে নিজের যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং সর্বাবস্থায় জামা'তের লোকদের তা'লীম ও তরবিয়তের কাজ অব্যাহত রাখেন। কেন্দ্রের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করেন। এভাবে তিনি তার গ্রামে নিজ বাড়ির উঠানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন আর সেখান থেকেই জামা'তের লোকদের তা'লীম ও তরবিয়্যতের কাজও সম্পাদন করতেন। একইভাবে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জামা'তের যে কোন অনুষ্ঠানে নিয়মিত দীর্ঘ সফর করে অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৯৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের সালানা জলসাতেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। হুযুরের সাথে গঞঅ-এর অনুষ্ঠান 'দি ফ্রেঞ্চ মুলাকাত' এ-ও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সাক্ষাতে তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন আর লোকজনকে শুনাতেন যে, এই সাক্ষাৎ আমার জীবনের অনেক সুন্দর একটি অংশ, যা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।

২০০৪ সনে আমি যখন বুরকিনাফাসু সফরে যাই সেখানে তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর আমাকে বলেন, এই যে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ আমার এক নতুন জীবন লাভ হয়েছে। আর আপনার এই সফরের ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন আর এই কল্যাণ আমি লাভ করছি। তিনি বলেন, দুই মাস পূর্বে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। এমনকি বাড়ির লোকেরা মনে করেছিল এটি আমার অন্তিম মুহূর্ত। তিনি বলেন, সেই সময় আমি স্বপ্নে দেখি, (তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখেন যে,) আমি তার মাথায় হাত বুলাচ্ছি। আর তিনি বলেন, স্বপ্নেই আমি অনুভব করি যে, আমার সমস্ত রোগ বালাই দেহ থেকে বিদায় নিয়েছে। তিনি বলেন, যখন আমি জাগ্রত হই তখন বাস্তবিক অর্থেই সমস্ত রোগ-বালাই দূর হয়ে গিয়েছিল, আর আমি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। যাহোক আমি যখন সেখানে সফরে যাই তখন তিনি বলেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা বাহ্যিকভাবেও পূর্ণ করে দিন। নিজের মাথা এগিয়ে দিয়ে তাতে হাত বুলিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন। খিলাফতের সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তিনি মানুষকে বলতেন যে, এই জীবন, যা আমি লাভ করেছি, এটি এজন্য পেয়েছি যেন আমি ধর্মের সেবা করি আর এখন আমি এই কাজেই নিজের জীবন অতিবাহিত করব। আর এই অঙ্গীকার তিনি রক্ষা করেছেন। তিনি ৯৪ বছর বয়স লাভ করেছিলেন আর শেষ বয়স পযর্ন্ত তিনি কর্মঠ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বার্ধক্য সত্ত্বেও নিকটবর্তী জামা'তগুলোতে স্বয়ং সফর করতেন। আমি যখন ২০০৮ স নে ঘানা সফরে যাই তখন আমার সাথে তার ২য় বার সাক্ষাৎ হয়। সেখানেও তিনি আসেন এবং জলসায় অংশগ্রহণ করেন, জুবলীর জলসা ছিল এটি। তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন।

মিশনারী বান্দুকু শাহেদ সাহেব বলেন, পাকিস্তানী মুবাল্লেগদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। অনেক বিনয় ও নম্রতার সাথে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাদের সাথে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। আর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও সর্বদা অগ্রগামী ছিলেন। নিয়মিত চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, এ বছর জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে আমি যখন তার গ্রামে সফরে যাই তখন মুয়াল্লেম সাহেব আমাকে বলেন যে, আমি এ বছর চলে যাব। আমি বললাম, আপনি কি কোথাও সফরে যাচ্ছেন? তিনি বলেন, না, আমি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, কেননা এ বছর আমি খুব খুশি। মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, এরপর তিনি বলেন আমি সারা জীবন আল্লাহ্র জন্য কাজ করেছি, (আল্লাহ্র সত্তায় তার দৃঢ় আস্থা ছিল,) আর এখন আমি নিজ পারিশ্রমিক নেয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে যাচ্ছি। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি তার পরিবারকে বলেন যে, এখন আল্লাহ্র সাথে আমার আর এক সপ্তাহের চুক্তি রয়েছে, অর্থাৎ এক সপ্তাহ সময় বাকি আছে। পরবর্তী শুক্রবার এক সপ্তাহ পরে, সকালে রীতি অনুযায়ী তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠেন, ওযু করেন, ওযু কেবল শেষ করেছিলেন যে, ওযু করতে করতে সেখানেই সেই স্থানে নিজের প্রকৃত স্রষ্টার সাথে মিলিত হন। সেখানেই তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান। তো এমন নিঃস্বার্থ এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ দূরদুরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরাও রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দান করেছেন। যারা ইসলামের বাণী পৃথিবীতে প্রচার করছেন। আল্লাহ্ তা'লা এমন নিঃস্বার্থ সেবক জামা'তকে সর্বদা দান করতে থাকুন যারা সত্যিকার সেবক হবেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে ৫ পুত্র ও ৬ কন্যাসন্তান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা সবাই আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দৃঢ়তা দিন এবং তারা যেন নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণকারী হয়। জুমুআর নামাযের পর আমি তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব। **********

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, Murshidabad.**

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

তাশাহুদ তাউয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্ব প্রথম আমি সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা জামাতে আহমদীয়ার সদস্য না হয়েও সহনাগরিক হিসেবে জামাতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রসারিত ভালবাসার হাত ধরতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা আমাদের মসজিদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন যেটি নিছক একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এটা একথার বহিঃপ্রকাশ যে, আপনারা সকলে উদারমনা এবং উদারচিত্তে নিজেদের পরিবেশে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে আগ্রহী আর আপনারা অবশ্যই অপরের ধর্মীয় পরিচয়কে ততটা গুরুত্বের চোখে দেখেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এতদঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কিছু সময়ের মধ্যে মসজিদ তৈরীর কাজ সম্পন্ন হবে। এর নাম রাখা হয়েছে বায়তুল হামীদ। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম যার দ্বারা আল্লাহ্র প্রশংসা করা হয়। কেননা খোদার সত্তা-ই সেই সত্তা যিনি প্রশংসার যোগ্য। আমরা মানুষ হয়ে একে অপরের প্রশংসা করে থাকি এবং করাও উচিত। কারো সৎগুণ দেখে তার প্রশংসনীয় দিক গুলি তুলে ধরা উচিত। এটিও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ। আর ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমাদের একে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও এক প্রকার প্রশংসা করাকেই বোঝানো হয়। তিনি বলেছেন- যদি তোমরা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞত না হও তবে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পার না। অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকে, যেমনটি আমি প্রথমেই আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছি, আর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরম রূপটি আল্লাহ্ তা'লার দিকে যায় যিনি আমাদেরকে এই মসজিদ নির্মাণেরও তৌফিক দান করেছেন আর এতদঞ্চলের মানুষের মনেও এই ভাবনা সঞ্চারিত করেছেন যার দরুন তারা যেন মসজিদের বিরোধিতা না করে আমাদের সঙ্গে সহায়তা করে। আর এই জন্য আমরা সকলে এখানকার মেয়র, কাউন্সিল এবং সর্বসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেমনটি আমি বলেছি, এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে বায়তুল হামীদ। যার অর্থ অনেক প্রশংসা করা হয়েছে যার। আর আল্লাহ্ তা'লার সত্তা-ই প্রশংসা যোগ্য। পাঁচ ওয়াক্ত প্রতিটি নামাযের প্রতি রাকাতে আমাদেরকে 'আল হামদো রাব্বিল আলামীন' পাঠ করার আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই সেই প্রভু প্রতিপালকের প্রশংসাকীর্তন কর যিনি সমগ্র জগতের প্রভু প্রতিপালক। যিনি মুসলমানদেরও প্রতিপালক, খৃষ্টানদেরও প্রতিপালক, ইহুদীদেরও প্রতিপালক আর হিন্দুদেরও প্রতিপালক। তাই যিনি সকলের প্রভু প্রতিপালক তাঁর প্রশংসা যখন আমরা করব তখন মানবতার মূল্যবোধের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে আমরা যখন তাঁরই প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করি তখন তা আমাদেরকে প্রত্যেক মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধার বিষয়ে মনোযোগী করে তোলে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন এই মসজিদটি তৈরী হয়ে াবে তখন মানবতার প্রতি প্রেম ও ভালবাসার এক নতুন পথ উন্মোচিত হবে। ইনশাআল্লাহ্॥ কেননা এই মসজিদে যারা পাঁচ ওয়াক্ত আসবে তাদেরকে তা এই কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিবে যে, এই মসজিদ তৈরীর নেপথ্যে এখানকার নাগরিকদেরও অবদান রয়েছে, কেননা তারা আমাদের কোনও বিরোধিতা করে নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক ধর্মের সম্পর্কে বলেছেন, তা খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে আর এটিই একজন প্রকৃত এবং সত্যিকার মুসলমানের ঈমানের অংশ। আমাদের ঈমান তথা ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রতিটি ধর্ম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ছিল, তাই সেই ধর্মগুলির বিরোধিতা করার, একে অপরের ভাবাবেগ এবং আবেগ অনুভূতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করার কোনও কারণ নেই। বরং কুরআন করীম ঘোষণা দিচ্ছে- সমস্ত ধর্মাবলম্বীদেরকে বলে দাও, এস, দেখ। আমাদের ও তোমাদের মাঝে এমন একটি বিষয় রয়েছে যা অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সেটি হল খোদা তা'লার সত্তা, আমরা সকলে যাঁর সৃষ্টি আর আমরা সকলে যাঁর ইবাদত করি। সুতরাং, এমন একটি কথা বা বাক্য আছে যার ভিত্তিতে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত আর সেটি হল খোদা তা'লার সত্তা। যদি প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা একথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে খোদা এক-অদ্বিতীয় যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সৃষ্টি করার পর প্রতিপালনের উপকরণ এবং জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করেন। তাই পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরী হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই নির্দেশের আলোকে একজন প্রকৃত মুসলমান তথা আহমদী মুসলমান প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। যদি এভাবে একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকে, অপরের আবেগ অনুভূতির বিষয়ে সংবেদনশীলতা থাকে তবে সমন্বয় বা একীভূত হওয়ার প্রশ্নটিই অবান্তর হয়ে পড়ে। তখন আমরা একথা বলব না আমরা ভিন দেশ থেকে আসা আহমদী তাই তোমাদের সঙ্গে একীভূত হতে পারব না। আপনি লক্ষ্য করবেন আর আমার পূর্বের বক্তা একথা উল্লেখ করেছেন যে, জামাত আহমদীয়া এই এলাকায় একীভূত হচ্ছে, জামাতের সদস্যরা সমাজের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করছে আর এটিই একজন প্রকৃত আহমদী মুসলমানের বিশেষত্ব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এখানে যদি কারো মনে কোন প্রকারের আশঙ্কা বা রক্ষণশীলতা থেকে থাকে- মসজিদ তৈরী হয়ে গেলে কী ঘটবে- যেমনটি তিনি বলেছেন, এখানে বিরোধিতা হয়েছে, কিন্তু খুব কম মানুষের পক্ষ থেকে। কিন্তু আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, বিবাদ বিপত্তি তৈরী হওয়া নিয়ে যদি কোনও মনের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, কোনও উৎকণ্ঠা ছিল ,তবে এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত আশঙ্ক দূর হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্॥ আর আগের থেকে বেশি আহমদীরা এখানে সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকবে। আর আপনাদের যাবতীয় আশঙ্কা ও উদ্বেগকে দূর করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হল, যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা। কেবল কষ্টের আশঙ্কা দূর করা নয়, যেমনটি সম্মানীয় বক্তা উল্লেখ করেছেন ,আশঙ্কা ছিল যাতে কোনও প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। আমরা শুধু অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কাই দূর করব না বরং যাবতীয় অসুবিধাকেই দূর করব। সকল ক্ষেত্রে ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের সেবা ও সহায়তার কাজে এগিয়ে আসব। অতএব, এই দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রত্যেক নাগরিকের এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এই মসজিদটি শান্তি ও ভালবাসার নতুন পথ উন্মোচিত করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সচরাচর বলা হয় যে, মানুষের কাজকর্ম থেকে জানা যায় যে সেটি সঠিক কি না। কিন্তু আমাদের রসুল করীম (সা.) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। কর্মের ফলাফল নির্ভর করে সদিচ্ছা বা সংকল্পের উপর। অনেক সময় মানুষ লোকদেখানো কাজ করে থাকে। কিন্তু সেই কাজের পিছনে তার উদ্দেশ্য সৎ থাকে না। তাই আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকটি কর্মের পিছনে সদুদ্দেশ্য থাকা উচিত। কোনও কাজ যেন কেবল লোকদেখানোর জন্য না হয়। বরং সৎ উদ্দেশ্যে হয়। আর প্রধান উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লা সন্তুষ্ট করা। সেই খোদাকে সন্তুষ্ট করা যিনি সকলের খোদা, যিনি সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সৃষ্টিজগতকে তিনি ভালবাসেন। অতএব, এই বিষয়টি সব সময় স্মরণ রাখবেন আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও এবং মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পরও এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর পক্ষ থেকে এবিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আমাদের উদ্দেশ্য সৎ, এর পেছনে কোনও লোকদেখানো বিষয় নেই, অন্য কোনও উদ্দেশ্য অর্জন এর লক্ষ্য নয়। এর পিছনে এতটুকু বিষয়ও নেই যে, কোনও মতে মসজিদটি তৈরী হয়ে যাক, এর পর আমরা নিজেদের খেয়ালখুশি মত কাজ করব। বরং মসজিদ নির্মাণের পর ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের পথ আরও প্রশস্ত হবে। ইনশাআল্লাহ। এই বিষয়টি এখানকার মানুস প্রত্যক্ষ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই এই বিষয়গুলি আমাদের শিক্ষার অংশ আর তা প্রত্যেক আহমদীর সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা বাঞ্ছনীয়। আজ পর্যন্ত আমি যেখানেই গেছি সেখানে বিভিন্ন আহমদী মসজিদের উদ্বোধন কয়েক বছর ধরে হচ্ছে। সর্বত্রই স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে এই বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, আহমদীরা ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। আর তারা এমনটি করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর পক্ষ থেকে এই গুণটির বহিঃপ্রকাশ পূর্বের থেকে বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। মসজিদ নির্মাণের পর পারস্পরিক ভালবাসা ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার পূর্বের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। আল্লাহ্ করুন এই মসজিদের নির্মান কাজ যেদিন সম্পন্ন হবে তখন নামাযের জন্য আগমণকারীরা যেন সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যা এলাকার মানুষের যাবতীয় আশঙ্কা ও রক্ষণশীলতা দূর করে দিবে এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ বজায় থাকুক। জাযাকুমুল্লাহ।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

২০২১ সালে মে মাসে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) -এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন: নামাযে অনেক সময় আমাদের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, এমন সময় আমরা নামাযকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি?

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লার ভীতি নিজের মাঝে সঞ্চার করা উচিত। আল্লাহ্কে ভয় করো? পড়াশুনা করো? পড়াশুনার ক্ষেত্রে তুমি যদি পড়াশোনা না করো, তাহলে তুমি কোন একটি বিষয় ফেল করতে পারো এ সম্পর্কে তুমি ভয় পাও? এর মানে আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার চাইতে তোমার পড়াশোনার ভয় বেশি। একজন যদি আল্লাহ্কে ভয় পায় তাহলে তার নামাযে কেন দুর্বলতা সৃষ্টি হবে? তুমি পড়াশুনায় কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেছ? তুমি তোমার পড়াশোনায় সময় ব্যয় করো এবং প্রতিদিন পড়াশোনা করো তাই নয় কি? পরীক্ষার পূর্বে ৬-৮ ঘন্টা আবার কখনও ৯ ঘন্টা পড়াশুনা করো, তাই না? তুমি এটি এজন্য করো যে, তোমার ভয় আছে যে, তুমি ফেল কর কি না। এবং তুমি এটিও ভয় করো যে, শিক্ষকের কথা গুরুত্ব সহকারে যদি না শোনা হয় তাহলে হয়তবা তুমি লেকচার সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ্র কথা মানুষ শোনে না এবং এই কারনেই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। এর অর্থ একজন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার চাইতে মানুষকে বেশি ভয় পায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে একজন একবার জিজ্ঞেস করে যে, তার কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয়! তখন তিনি একটি নীতি উল্লেখ করেন এবং সেটি হল, "আল্লাহ্কে ভয়ে সবকিছু করো।" আল্লাহ্র ভয় থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: নামাযের মনোযোগ কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর: নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা এটি প্রত্যেকের জন্য অনেক স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যখন তুমি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছো তুমি বারবার তিলাওয়াত করছো "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"। এবং তারপর যদি শয়তান পরাস্ত করতে চায় তখন তুমি "আউযুবিল্লাহ"পড়ো এবং পুনরায় মনোযোগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করো। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে তোমার অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে যে, (নামাজে) কীভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হয়। ঠিক আছে? সবাই মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে। এটিকেও নামাজ কায়েম করা বলা হয় এবং এটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে, যদি কেউ নামাজে মনোযোগ হারিয়ে ফেলে- এর অর্থ যে তার নামাজ নিচে পড়ে গেছে। তাই এখন তাকে এটি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, দাঁড় করাতে হবে। কায়মে-এ-নামাজ এর অর্থ নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এখন কেউ কীভাবে নামাজ দাঁড় করাতে পারে বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এর জন্য একজনের পুনরায় (নামাজে) মনোযোগ আনতে হবে। যদি নিয়ত বাঁধার পরে তুমি দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকো এবং তোমার মনোযোগ একদম অন্যদিকে চলে যায়। এবং ২-৩ মিনিট পরে যখন তুমি বুঝতে পারো যে ওহ, আমি তো এটি পড়েছিলাম কিন্তু জানি না এখন কোথায় চলে গেছি, তখন পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করো। যখন এক নামাজে পাঁচ বার সূরা ফাতিহা পড়বে তখন পরবতী সময় থেকে নামাজে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে তোমার মনে থাকবে।

প্রশ্ন: কাযা নামায কখন আদায় করতে পারি?উত্তর: নামাজ কাযা করার কি প্রয়োজন রয়েছে? এমন প্রশ্ন করাই ঠিক না। আসল কথা হচ্ছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে যে, যখন কোন একটি কারণে নামাজ আদায় করতে পারলে না, মাগরিবের সময় পার হয়ে গেছে অথবা ফজরের সময়ও পার হয়ে গেছে। ফজর, মাগরিব এবং ঈশা এসব নামাজ পরবতীতে কাযা হিসেবে আদায় করা যাবে যদি এর পিছনে কোন বৈধ কারণ থাকে। ফজরের কাযা নামাজও পরবতী ফজরের সাথে কাযা হিসেবে পড়া যেতে পারে। কিন্তু এধরনের পরিস্থিতি সবসময় সৃষ্টি হয় না। হ্যাঁ যদি তুমি কখনো জঙ্গালে আটকে যাও; যেখানে অন্য কোন উপায় নেই তাহলে এটি একটি বৈধ কারণ (নামাজ কাযা কায়েম করার জন্য)। অন্যথায় যদি তুমি স্বাভাবিক জীবন যাপন কর তাহলে নামাজ কাযা করার প্রশ্নই থাকতে পারে না। তুমি কি কাযা নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ নাকি কসর নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ? কাযা মানে যখন নামাজ ছুটে যায় এবং নামাজের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় এটি বুঝাতে চেয়েছ? বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার জঙ্গালে আগুন লেগেছে। যদি এখন তুমি ওখানে কাউকে সাহায্য করছ অথবা কারো জিনিসপত্র বের করে দিচ্ছ এমন সময় যদি তোমার নামাজের সময় পার হয়ে যায় এবং তুমি নেকির কাজ করছিলে এমন সময় তোমার নামাজ ছুটে গেল। তখন তুমি যে নামাজগুলো ছুটে গেছে সেসব নামাজ একত্রে আদায় করতে পার। যদি তুমি কোন যুদ্ধের মধ্যে থাক, মহানবী (সা.)-এর একবার এমনটি হয়েছিল একদা শত্রুরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ করছিল তখন তাঁদের নামাজ আদায় করার সুযোগ হয় নি। তারপর সন্ধার সময় নবী (সা.) চার ওয়াক্তের নামাজ একত্রে আদায় করেন। তিনি (সা.) বর্ণনা করেন যে, "ধিক্কার ঐ সকল শত্রুদের যারা আমাদের নামাজ কাযা করে দিল এবং সব নামাজ এখন একত্রে আদায় করতে হবে"। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে নামাজ কাযা আদায় করা যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নামাজ কাযা করার কোন বিধান নাই।প্রশ্ন: আপনি কি কখনও চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন আর যদি হন, আপনি তা কীভাবে মোকাবিলা করেন?

উত্তর: আমি তখন আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি। এবং বলি যে, হে

আল্লাহ্পাক! আমাকে সাহায্য কর এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা ও সমস্যার সমাধান করে দাও।(ক্রমশ..)

১ম পাতার পর.....

নিজেদের অজুহাত পেশ করবে। অতএব 'লা-ইউযানা'-এর অর্থ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না অথবা এর অর্থ শাফায়াত-এর আর এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, হাশরের দিন যখন নবীগণ উপস্থিত হবেন আর তাদেরকে নিজ নিজ জাতির সেই সব ব্যক্তিদের পক্ষে শাফায়ত করার অনুমতি দেওয়া হবে যারা ধর্ম পুরোপুরি মেনে চলত না, কিন্তু এই যোগ্যতা অর্জন করেছিল যে নবী তাদেরকে আপন বলতে পারতেন, সেই সময় এরা শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে আর তাদের সপক্ষে শাফায়াত করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কুরআন করীম এবং হাদীসে শাফায়াতের বিষয়ে একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটা অনুমতিক্রমে করা হয়। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ

(সূরা সাবা: ৩য় রুকু) অর্থাৎ শাফায়াত কেবল তাদেরই উপকারে আসবে যাদের পক্ষে আল্লাহ্র অনুমতি থাকবে। সূরা ইউনুসের ১ম রুকু, তাহার ৬ষ্ঠ রুকু এবং নাজাম -এর ২য় রুকুতে এই বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আর সুরা বাকারার ৩৪ নং রুকুতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। হাদীসেও শাফায়াত প্রসঙ্গে অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

মসদন আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, ৪৩ পৃষ্ঠায় আবু বাকার (রা.) বর্ণনায় রয়েছে-

ثُمَّ يُؤْذَنُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ اَنْ يَشْفَعُوْا

অর্থাৎ অতঃপর ফিরিশতা,নবী এবং শহীদদেরকে আল্লাহ্ তা'লা শাফায়াত করার অনুমতি দিবেন।

কুরআন করীমে অনুমতি প্রসঙ্গে আরও একটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা মুরসেলাত-এর বর্ণিত আছে وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ অর্থাৎ কাফেরদের কোনও ওজর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কোনও উপযুক্ত অজুহাত খাড়া করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

এই যে বলা হয়েছে- কিয়ামতের দিন আম্বিয়াগণকে সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করানো হবে- আমার মতে আম্বিয়াগণের সাক্ষ্য বলতে তাদের দৃষ্টান্তকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐশী বাণী তাদের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তার নমুনা তারা পেশ করবেন। এই শিক্ষা মান্য করার পরিণামে তারা খোদাকে লাভ করেছেন আর উন্নতির শিখরে পোঁছে গেছেন। এইরূপে খোদা তা'লা কাফেরদের লজ্জা দিবেন। তিনি পরোক্ষে তাদের বলবেন, দেখ আমার বাণীর নিদর্শন! এর পরিণামে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে আমার এই নবী এই ঔৎকর্ষে পোঁছেছে। অপরদিকে তোমরা এই বাণীকে অস্বীকার করে কোথায় অধঃপতিত হয়েছে!

প্রত্যেক নবী ঐশী বাণীর পরিণামের এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকেন। এই কারণেই নবী ছাড়া ঐশী অবতীর্ণ হয় না। নবীর দ্বারা ঐশী বাণীর মর্যাদা এবং ঐশী বাণী দ্বারা নবীর মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১৪)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

অনেক কিছুই খোদার আসন দখল করে।যুগের বিরাজমান পরিস্থিতি একজন দক্ষ চিকিৎসক ও সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর ঐশী পথনির্দেশের যারপরনাই আবশ্যকতা ছিল।

সুতরাং এমন সর্বগ্রাসী ভ্রষ্টতার যুগে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভূত হওয়া অধিকন্তু তাঁর পৃথিবীতে এসে বিশ্ব-মানবতাকে একত্ববাদ ও সৎকর্মের মাধ্যমে আলোকিত করা এবং সকল দুষ্কৃতির মূল অর্থাৎ শিরক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা, এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসূল এবং রসূলদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। (বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম ও ২য় খণ্ড, টীকা ১০, পৃ. ১১২-১১৩)একদিকে তিনি একত্ববাদ ও সৎকর্ম প্রতিষ্ঠা করেন আর অপর দিকে বিরাজমান সৃষ্টিপূজা ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করেন। তিনি বলেন, এই বিষয়গুলো সকল প্রকার পাপ বা অন্যায়ের মূল। স্বয়ং পাদ্রীরা এটি স্বীকার করেছে যে, মহানবী (সা.) যখন প্রেরিত হন, সেই যুগে শিরক সর্বত্র মারাত্মকভাবে বিরাজমান ছিল। মহানবী (সা.) সবচেয়ে বেশি ঐশী জ্যোতি অর্জন করেছেন এবং সকল নবী অপেক্ষা অধিক জ্যোতি অর্জনকারী আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে নবীগণের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ- এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "বস্তুত আল্লাহ্ তা'লার ওহী এমনই এক আয়না, যাতে খোদা তা'লার অনুপম গুণাবলীর চেহারা যে নবীর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় তাঁর অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা অনুসারে প্রকাশ পায়। যেহেতু মহানবী (সা.) নিজের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, বক্ষের প্রশস্ততা, নিষ্কলুষতা ও লজ্জাবোধ, নিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা, খোদার প্রতি আস্থা ও বিশ্বস্ততা আর খোদাপ্রেমের জন্য আবশ্যকীয় সব গুণের ক্ষেত্রে সকল নবীর চেয়ে অগ্রগামী, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বমহান, সবচেয়ে পরিপূর্ণ, সর্বোচ্চ, সর্বোজ্জ্বল এবং সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন ছিলেন, তাই মহা মহিমান্বিত খোদা শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ সৌরভে তাঁকেই (সা.) সবচেয়ে বেশি সুরভিত করেছেন। আর সেই বক্ষ ও হৃদয়, যা পূর্বাপর সবার বক্ষ এবং হৃদয় থেকে অধিক প্রশস্ত, অধিক পবিত্র, অধিক নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ ও বেশি উজ্জ্বল ছিল, তা এমন ওহীর অবতরণস্থল হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে, যা পূর্বাপর সবার ওহীর চেয়ে বেশি দৃঢ়, সর্বোৎকৃষ্ট, সবচেয়ে মহান এবং পরিপূর্ণ হওয়ার সুবাদে ঐশী গুণাবলী প্রকাশের জন্য এক অত্যন্ত স্বচ্ছ, প্রশস্ত এবং বিশাল আয়নাস্বরূপ।" (সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১, টিকা)অর্থাৎ এমন ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যা ছিল পরম মার্গের, সর্বোচ্চ মর্যাদায় উপনীত এবং পূর্ণাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ, যেন ঐশী গুণাবলী তথা খোদা তা'লার গুণাবলী প্রদর্শন করা যায়। তাঁর উক্তি অনুসারে মহানবী (সা.) তা প্রদর্শনের এক আয়না ছিলেন। তাঁর প্রতি সেই ওহী নাযেল হয়েছে এবং তাঁর সত্তায় প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে তা বিস্তার লাভ করেছে।

তিনি বলেন- অতএব, এ কারণেই পবিত্র কুরআন এমন মহান শ্রেষ্ঠত্ব নিজের মাঝে ধারণ করে যে, এর তেজোদীপ্ত রশ্মি এবং প্রখর কিরণের সামনে অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থের আলো বিলুপ্তপ্রায়। কোন মস্তিষ্ক এমন কোন সত্য আবিষ্কার করতে পারবে না যা পূর্ব থেকেই এতে বিদ্যমান নেই। কোন যৌক্তিক চিন্তাধারা এমন কোন যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবে না যা পূর্বেই এই কুরআন উপস্থাপন করে নি। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনে সবই বিদ্যমান। কোন বক্তৃতাই কোন হৃদয়ে এমন শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে পারে না যেমন শক্তিশালী এবং আশিসময় প্রভাব এটি লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে বিস্তার করে চলেছে, অর্থাৎ যারা কুরআন বুঝার চেষ্টা করে। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলীর এক অত্যন্ত স্বচ্ছ আয়না যাতে সেই সমস্ত কিছুলাভ হয় যা পুণ্যের এক পথযাত্রীর তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চতর মার্গে পৌঁছার জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। (সুরমা চশমা আরিয়া, পৃ. ২৩-২৪, পাদটীকা)

অতএব এই হলো মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি। এই শিক্ষার বাইরে যখন আর কোন কিছুই নেই তখন এই অপবাদ কীভাবে আরোপ করা যেতে পারে যে, নাউযুবিল্লাহ্ তিনি মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআনের মহান মর্যাদাকে খাঁটো করেছেন? তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্ তা'লার মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া সম্ভব। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়ত বুঝার মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। মহানবী (সা.)-এর যে গভীর প্রভাববিস্তারী পবিত্রকরণ শক্তি ছিল তা-ই সাহাবীদের আধ্যাত্মিক উন্নতিকেও পরম মার্গে উপনীত করেছে- এ বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কোন বুদ্ধিমান মানুষের সামনে গোপন থাকতে পারে না যে, মহানবী (সা.)-এর জন্মভূমি অর্থাৎ জন্মস্থল একটি বদ্বীপ যাকে আরব বলা হয়, যা সব সময় অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে যেন এক নির্জন কোণেই পড়ে ছিল। মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সে দেশের মানুষের সম্পূর্ণভাবে বন্য ও হিংস্র পশুর মতো জীবন অতিবাহিত করা আর ধর্ম, ঈমান, আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকা এবং শত শত বছর থেকে প্রতিমাপূজা ও নানাবিধ নোংরা ধ্যানধারণায় নিমজ্জিত থাকা, এছাড়া বিলাসিতা, পাপাশক্তি, মদ্যপান, জুয়া খেলা ইত্যাদি পাপাচার ও লাম্পট্যে চরম পর্যায়ে পৌঁছা আর চুরি, ডাকাতি, রক্তপাত, কন্যা নিধন অর্থাৎ কন্যা সন্তানদের হত্যা করা, এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ এবং অন্যের অধিকার পদদলিত করাকে কোন পাপ মনে না করা; এক কথায় সকল প্রকার মন্দ অবস্থা এবং সকল প্রকার অমানিশা ও ঔদাসিন্য সার্বিকভাবে সকল আরবের হৃদয়ে ছেয়ে থাকা এমন একটি সুবিদিত বিষয় যা কিছুটা জ্ঞান থাকলে কোন বিদ্বেষপরায়ণ বিরোধীও অস্বীকার করতে পারবে না।তিনি আরো বলেন, এ বিষয়টি সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সামনে স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করা আর কুরআন মানার পর সেই অজ্ঞ, বন্য ও নোংরা প্রকৃতির মানুষগুলোর মাঝে কত অনুপম পরিবর্তন সাধিত হয় আর ঐশী বাণীর পবিত্র প্রভাব এবং নিষ্পাপ নবীর সাহচর্য বিস্ময়করভাবে স্বল্পতম সময়ে তাদের হৃদয়কে নিমিষে এমনভাবে পরিবর্তন করে দেয় যে, অজ্ঞতার অবসানে তারা ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে যায়, জগৎপ্রেম ছেড়ে দিয়ে খোদাপ্রেমে এমনভাবে বিলীন হয় (অর্থাৎ পূর্বে দুনিয়ার মোহ ছিল কিন্তু এরপর খোদার ভালোবাসায় এমনভাবে আত্মবিলীন হয়) যে, স্বদেশ, সহায়-সম্পদ, আত্মীয়স্বজন, মান-সম্মান এবং নিজেদের জীবনের আরাম-আয়েশকে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিসর্জন দেয়। অতএব তাদের পূর্বের অবস্থা এবং ইসলাম গ্রহণের পর লাভ হওয়া এ নবজীবন তথা এই উভয় ধারার কথা পবিত্র কুরআনে এত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, পড়ার সময় একজন পুণ্যবান পূত হৃদয়ের মানুষের চোখ অবলীলায় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়।অতএব সেই বিষয়টি কী ছিল, যা তাদেরকে এত দ্রুত এক জগৎ থেকে ভিন্ন জগতে টেনে নিয়ে গেছে। তা কেবল দুটো বিষয় ছিল। একটি হলো, সেই নিষ্পাপ নবী নিজ পবিত্রকরণ শক্তিতে খুবই শক্তিশালী ছিলেন, এমন প্রভাব-শক্তি রাখতেন যে, পূর্বেও এমন কেউ জন্মে নি এবং ভবিষ্যতেও জন্মাবে না। আর দ্বিতীয়ত, সর্বশক্তিমান, চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা খোদার পবিত্র বাণীর অসাধারণ এবং বিস্ময়কর প্রভাব ছিল যা অনেক বড় এক জনগোষ্ঠিকে সহস্র সহস্র অমানিশা থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে এসেছে। নিঃসন্দেহে কুরআনের এসব প্রভাব অলৌকিক এবং অসাধারণ, কেননা কখনো কোন গ্রন্থ এমন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে পৃথিবীর কেউ দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারবে না। কে এই প্রমাণ দিতে পারবে যে, কোন গ্রন্থ এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন এবং সংশোধন করেছে যেমনটি কুরআনে করীম করেছে? যে আলো মহানবী (সা.) লাভ করেছেন তা অন্য কেউ লাভ করে নি- এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতি যা মানবকে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণ-মানবকে, যা ফেরেশতাদের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রেও ছিল না, সূর্যেও ছিল না, যা পৃথিবীর সমুদ্রগুলোতে ছিল না, নদীসমূহেও ছিল না, ছিল না মনিমানিক্যে, পান্নাতে এবং মুক্তাতেও, তা ছিল কেবল মানবের মধ্যে, অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মাঝে, যার শ্রেষ্ঠতম এবং পূর্ণতম, সর্বোত্তম এবং সুন্দরতম অস্তিত্ব হলেন, আমাদের নেতা ও মনিব, নবীগণের নেতা, অমর জীবনপ্রাপ্তদের সর্দার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অতএব সেই জ্যোতি দান করা হয়েছে এই পূর্ণমানবকেই এবং মর্যাদা অনুপাতে তাঁর রঙে রঙিন সেসব মানুষকেও যারা নিজেদের মধ্যে কিছুনা কিছুসেই বৈশিষ্ট্য রাখে আর যারা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণকারী এবং সত্যিকার অর্থে তাঁর আদর্শে জীবনযাপন করে।

তিনি বলেন, এই মর্যাদা সর্বোচ্চ, সর্বোৎকৃষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গীনরূপে আমাদের নেতা, আমাদের মনিব, আমাদের পথপ্রদর্শক, উম্মী (নিরক্ষর) নবী, সত্যবাদী এবং সত্যায়িত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর মাঝে বিদ্যমান ছিল যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই পবিত্র কুরআনে বলেন, (সূরা আনআম: ১৫৪, ১৬২-১৬৩, সূরা আলে ইমরান: ৩২, সূরা আলে ইমরান: ২১, সূরা মোমেন: ৬৭)

তিনি বলেন যে, তাদেরকে বলে দাও, আমার নামায এবং ইবাদতে আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ্র পথে নিবেদিত। সেই খোদা যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু, যার কোন শরীক নেই, আর আমাকে এ কথারই (প্রচারের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর আমি

সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, এই ঘোষণা দাও যে, আমি আওয়ালুল মুসলেমীন তথা সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী, অর্থাৎ পৃথিবীর সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত আমার মতো কোন পূর্ণমানব নেই, যে এভাবে খোদার সত্তায় বিলীন এবং খোদা তা'লার সকল আমানত তাকে প্রত্যার্পণকারী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াতে সেই সব নির্বোধ একত্ববাদীদের খণ্ডন রয়েছে যারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে যে, আমাদের নবী (সা.) অন্যান্য নবীর ওপর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন বলে প্রমাণিত নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই সকল নির্বোধ একত্ববাদীদের খণ্ডন এতে করা হয়েছে অর্থাৎ তারা বলে যে, অন্য নবীদের ওপর আমাদের মহানবীর পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত নয় আর নিজেদের কথার প্রমাণস্বরূপ তারা বিভিন্ন দুর্বল হাদীস উপস্থাপন করে। যেমন রসূলে করীম (সা.) বলেছেন আমাকে ইউনুস বিন মাত্তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না। এসব নির্বোধ জানে না যে, সেই হাদীস সঠিক হলেও তা বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ ছিল, যা আমাদের নবী (সা.)-এর স্বভাবজাত অভ্যাস ছিল। প্রতিটি কথা স্থানকালপাত্রভেদে হয়ে থাকে। যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি তার পত্রে 'আহকার ইবাদুল্লাহ্' লেখে তাহলে এর দ্বারা এই অর্থ বের করা যে, এই ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সারা পৃথিবীর মানুষ এমনকি প্রতিমাপূজারী এবং সকল পাপাচারীদের চেয়েও ঘৃণ্য এবং প্রমাণস্বরূপ এটি বলা যে, সে নিজেই স্বীকার করেছে যে, সে সব মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট- এটি কত বড় নির্বুদ্ধিতা এবং দুষ্কৃতি। পত্রে এমনটি লেখা মানুষের বিনয়ের বহিঃপ্রকাশের জন্য হয়ে থাকে। গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এর নাম আওওয়ালুল মুসলেমীন লিখেছেন বা রেখেছেন আর তাঁকে সকল অনুগতদের নেতা আখ্যায়ীত করেছেন এবং সর্বপ্রথম আমানত প্রত্যর্পণকারী মহানবী (সা.)-কে আখ্যা দিয়েছেন, সেখানে কুরআনের কোন মান্যকারীর এ সুযোগ আছে কি যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মহান পদমর্যাদা সম্পর্কে কোন বিতর্কে লিপ্ত হবে? আল্লাহ্ তা'লা উল্লিখিত আয়াতে ইসলামের মানগত বিভিন্ন পর্যায় অন্তর্ভুক্ত করে মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র প্রকৃতিকে সকল পদমর্যাদার চেয়ে উন্নততর আখ্যা দিয়েছেন। ইসলামে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তর আছে, সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক স্তরের দৃষ্টান্ত হলো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তা, কেননা আল্লাহ্ তালা তাঁর ফিতরত বা প্রকৃতিকে সেই মর্যাদা দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ্, মা আ'যামা শা'নুকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ পবিত্র, কত মহান তোমার মর্যাদা হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)। এরপর ফারসী পঙ্‌ক্তি রয়েছে,

মূসা এবং ঈসা সবাই তোমার বাহিনী, সবাই এই পথে তোমারই বদান্যতায় রয়েছে। মূসা এবং ঈসা তোমারই অনুসারী। তিনি(আ.) অবশিষ্ট আয়াতগুলোর অনুবাদ করে বলেন- মহাপ্রতাপান্বিত খোদা নিজের রসূলকে বলেন যে, এদেরকে বলে দাও, আমার পথই সোজা পথ। অতএব তোমরা এই পথেরই অনুসরণ কর এবং অন্য পথে চলো না। কেননা, সেগুলো তোমাদেরকে খোদা তা'লা থেকে দূরে ঠেলে দিবে। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তাহলে আস, আমার পিছনে চল, অর্থাৎ আমার পন্থা অনুসরণ কর, যা ইসলামের প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব, এই পথে পদচারণা কর, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। তাদেরকে বলে দাও, আমার পথ হলো অর্থাৎ আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমার পুরো সত্তা তাঁর সমীপে সমর্পণ করি আর নিজেকে যেন বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য একান্তভাবে নিবেদন করি। এটিই হলো আমার জন্য নির্দেশ, যদি আমার অনুসরণ কর তাহলে এই পদমর্যাদা লাভ করবে, সত্যিকার মুসলমান হবে। নির্দেশ হলো- আমি নিজেকে যেন সম্পূর্ণভাবে রাব্বুল আলামিনের সত্তায় নিবেদন করি অর্থাৎ রাব্বুল-আলামিনের সত্তায় বিলীন হই। এর অর্থ হলো, তিনি যেমন বিশ্ব প্রতিপালক আমিও যেন বিশ্বের সেবক হই এবং আপাদমস্তক যেন তাঁর হয়ে যাই এবং তাঁর পথের পথিক হয়ে যাই। অতএব, আমি আমার পুরো সত্তা এবং আমার যা কিছু ছিল সব কিছুখোদার হাতে তুলে দিয়েছি। এখন কিছুই আমার নয়, যা কিছু আমার সেই সবই তাঁর।(ক্রমশ...)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

শেষের পাতার পর.....

ঢেকুর ওঠে। তাই একটা সাদামাটা রুটিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। একটি সমাজ হিসেবে আমরা এই রীতি বানিয়ে ফেলেছি যে রমযানের ইফতারিতে অবশ্যই কোনও বিশেষ খাদ্য খেতে হবে। এমনিতে আমরা একদিকে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়াচ্ছি, উপরন্তু পেটও খারাপ হচ্ছে। আর রোযা রেখে সারাটি দিন অলস অলস কাটে। রোযা রাখার আনন্দ তখন আসে যখন আপনি যে সাধারণ খাদ্য খান সেই খাদ্য দিয়ে সেহরী করেন আর তা দিয়েই ইফতারি করেন। আর রাজকীয় খাদ্য কিনতে যে পয়সা খরচ করে থাকেন তা সদকা খয়রাত হিসেবে দিয়ে দেন।

একজন নাসেরা তাকওয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি হাদীস উপস্থাপন করে যা এইরূপ- 'পৃথিবী মোমেনদের জন্য বন্দীখানা আর কাফেরদের জন্য 'জান্নাত'। এরপর মেয়েটি হুযুর আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে যে, কেউ যদি নিজের ধর্মীয় প্রয়োজনাদি পূর্ণ করার পর জাগতিক উপকরণগুলিকে ভোগ করে, তবে কি সে মুত্তাকি নয়?

হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন- 'এই হাদীসের অর্থ হল, মুত্তাকি ব্যক্তি জাগতিক বিষয়াদিকে ধর্মীয় শিক্ষা, ইবাদত এবং ধর্মীয় কর্তব্যাবলীর উপর প্রাধান্য দেয় না। আপনি যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিচ্ছেন, পাঁচ ওয়াক্ত মনোযোগ দিয়ে নামায পড়ছেন, নামাযকে যত্নসহকারে পড়ছেন আর ইসতেগফার করছেন আর আল্লাহ্ তা'লাকে সারাদিন স্মরণ করতে থাকেন , সেই সঙ্গে চাকরীও করেন আর আপনার মোটা টাকা আয়ও হয়। তখন আপনি যেহেতু অর্থ উপার্জন করছেন আর জাগতিক বিষয়াদিও উপভোগ করছেন , আপনি গাড়িও ব্যবহার করছেন, ভাল কাপড় পরছেন ভাল বাড়িতে থাকছেন- এগুলি এমন সব বিষয় যা বর্তমানে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যক। এগুলি আপনাকে স্বাচ্ছন্দ ও সুবিধা এনে দেয় আর এগুলিকে আপনি উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু কেবল এই বিষয়গুলির পেছনে ছুটলেই চলবে না। আর এমনটা যেন না হয় এই করে খোদাকে ভুলে গেলেন। খোদা তা'লাকে স্মরণ রেখে আপনি যদি এই সব কিছুও অর্জন করেন আর নিজের জীবনকেও স্ত্রী ও সন্তানের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলেন, তবে কোনও অসুবিধে নেই। এর অর্থ কেবল এতটুকু যে, যারা কেবল ইহজগতকেই চিরন্তর বলে ভেবে বসে আছে আর হুকুকুল্লাহ্ ভুলে গেছে, তখন এই পৃথিবী আপনার জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়। যদিও আপনার দৃষ্টিতে তা জান্নাত বলে মনে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তা আপনার জন্য শুভ নয়। এর বিপরীতে এক ব্যক্তি যে কি না সব সময় হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ পালনকারী আর আল্লাহ্ তা'লার যাবতীয় আদেশাবলী পালনকারী, যদিও তার জন্য সব সময় সেই সব অধিকারসমূহ পুঙ্খানাপুঙ্খভাবে পূর্ণ করা কঠিন হয় আর অনেক সময় এই কাজে কষ্ট অনুভূত হয়। সেক্ষেত্রে লোকেরা মনে করে যে, এই পৃথিবী তাদের জন্য কয়েদখানা, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন- এমন লোকেরা পরকালে নিজেদের জন্য জান্নাতের উপকরণ তৈরী করছে। তাই আমরা যদি জাগতিক উপকরণসমূহ উপভোগ করি, তবে সেক্ষেত্রেও যেন এদিকে দৃষ্টি থাকে যে আপনি হুকুকুল্লাহকে প্রধান্যদানকারী আর খোদা তা'লার আদেশাবলী মান্যকারী।

* একজন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, কেউ যদি বলে সে আহমদীয়াতের উপর ঈমান এনেছে এবং সেই সব শিক্ষাবলীর উপরও আমল করে, কিন্তু সে বয়আত করে নি। এক্ষেত্রে কি এমন পুরুষ কিম্বা মহিলাকে আহমদী বলা যাবে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি সে বলে যে আহমদীয়াতের উপর সে ঈমান আনে অথচ বয়আত করে না, তবে এর অর্থ হল সে জামাতে যোগদান করার প্রধান শর্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর প্রত্যেক মান্যকারীদেরকে বয়আত করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তারা জামাতের অংশে পরিণত হয় আর সম্পূর্ণভাবে জামাতের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়। অতঃপর জামাতের নিয়ম-শৃঙ্খলা যেন সে পুরোপুরি মেনে চলে। যদি সে বলে আহমদীয়াতের উপর ঈমান আনে আর মসীহ মওউদ (আ.) সত্য হওয়ার বিষয়ে ঈমান আনে আর একথা বিশ্বাস করে যে তিনিই সেই মাহদী যার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত (সা.) করেছিলেন। কিন্তু সে যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত না করে বা তাঁর খলীফাদের হাতে বয়আত করে জামাতে প্রবেশ না করে তবে আমরা তাকে সৎ মানুষ বললেও তাকে আহমদী বলতে পারব না। বয়আত করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, কুরআন করীমে লেখা আছে যে আঁ হযরত (সা.) বয়আত গ্রহণ করতেন। (ক্রমশ.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

Vol-7 Thursday, 4 Aug, 2022 Issue No. 31

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বাঙ্গালী আহমদীদের সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)–এর উক্তি।

যখন কোন জাতির সদস্যরা মতানৈক্যের আগুনে ঘি ঢালে তখন সে জাতি টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং তাদের গতি মন্থর হয়ে যায়। দেখ! যখন মুসলমানরা একতাবদ্ধ না থাকলো তখন সমস্ত জগতে তাদের সম্মান বিনষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে ১৩০০ বছরের পশ্চাৎপদতার পর খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–কে প্রেরণ করলেন এবং চাইলেন, মুসলমান যেন তাঁর (আ.) মাধ্যমে পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে যায়।

অতি সম্প্রতি আমি খবর পেয়েছি, লোকেরা এ চিন্তাধারায় হাওয়া দিচ্ছে যে, যেহেতু খলীফা ভুল করতে পারে তাই তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। উক্ত চিন্তাধারা বাহ্যত সাধারণ মনে হলেও এ চিন্তাধারা–ই বিগত মুসলিম জাতিকে অবশেষে ধ্বংসে নিপতিত করেছে। বাহ্যত স্বাভাবিক মনে হওয়া এ নীতি তোমাদের জামা'তকে ধ্বংস করার কারণ হতে পারে। এমতাবস্থায় আমার এ ঘোষণা দেয়া বৈ কোন উপায় নেই যে, আমি প্রত্যেক সত্যিকার আহমদীর কাছে এ আশা রাখি, তারা ঐ লোকদেরকে যেন আমার অনুসারী মনে না করে, বরং তাদেরকে স্বাধীন এবং আমার অবস্থানের বিদ্রোহী মনে করে। যদি তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে এ ঘোষণা শুনে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত আর আমি যে ভুল করেছি আর যে জিনিস আমি ধ্বংস করেছি, তাদের তা সংশোধন এবং পুনঃনির্মাণ করার জন্য কোমর বেধে নেমে পড়া উচিত আর তাদের ঈমান–আমলের উচ্চমান প্রকাশ করা উচিত।

অতএব আমি এ আশা নিয়ে জামা'তে আহমদীয়া বাঙ্গালে উক্ত পত্র প্রেরণ করছি যে, যদি তারা তাদের কেন্দ্র এবং তাদের খলীফার প্রতি ভক্তি–ভালবাসা রাখে তাহলে তারা যেন কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ না করে তাদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তাদের সাথে কোন ধরনের সম্বন্ধ রাখবে না আর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাদের চিন্তাধারাকে খণ্ডন করবে। যদি আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমাকে সুস্বাস্থ্য দান করেন তাহলে আমি ইনশাআল্লাহ্ বাঙ্গাল থেকে এ মন্দ বিষয়টি দূর করার পূর্ণ চেষ্টা করব। কিন্তু আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা যদি অন্য কিছু থেকে থাকে তবুও তিনি তোমাদের সাথে তেমনই আচরণ করবেন যেমন আচরণ তোমরা আমার সাথে করতে থাকবে। আমার সম্মানের প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ নয়, এটা খোদার কাজ। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্তু আমি যদি এ জগতে খোদা তা'লার সত্যিকার প্রতিনিধি হয়ে থাকি, তাহলে সেই অভিশাপকে ভয় কর যা তোমাদের পিছুধাওয়া করছে এবং নিজেদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখো। আহমদীয়াতের ওপর থেকে তোমাদের বুলিসর্বস্ব ঈমানটুকুও যেন চলে না যায়। আল্লাহ তা'লা সুনিশ্চিৎ আহমদীয়াতকে সুরক্ষা করবেন। তিনি মহাশক্তিধর। তিনি এমন লোকদের সামনে আনবেন (দায়িত্ব দিবেন) যারা তোমাদের মাঝ থেকেই হবে কিন্তু আত্মত্যাগে তারা তোমাদের চেয়ে আরো অগ্রগামী হবে। আর এভাবে তাদের কুরবানীর মাধ্যমে আহমদীয়াত আরও দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। আহমদীয়াতের উন্নতি না ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর নির্ভর করে আর না সাবরেজিস্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ওপর। আর তাদের মাঝে কেউ খোদা তা'লার শাস্তির বাইরে নয়, ডেপুটি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও নয় এবং রেজিস্টার পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও নয়।

আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে, তোমরা খোদা তা'লার শাস্তির অপেক্ষা কর। আমি জানি তা আসছে। আর উর্ধ্বলোকের খোদা আমার সাথে আছেন। আমি বলছি না, খোদার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর এরপর সত্য চিনে নাও বরং আমি তোমাদেরকে কেবল এটুকু বলতে পারি, খোদা আমার সাথে আছেন আর যে কেউ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে সে সুনিশ্চিৎ খোদার পক্ষ থেকে শাস্তি পাবে আর তার এবং তার দলের প্রভাব–প্রতিপত্তি তাকে খোদা তা'লার গজব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তোমাদের এখনও চিন্তা–ভাবনা করার সময় আছে এবং কুরআনে বর্ণিত খোদা তা'লার আকাঙ্খা বুঝারও সময় আছে। যদি তোমরা সময়মত উপলব্ধি না কর সেক্ষেত্রে তোমাদের বিনাশ তোমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে।

মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও
মুসলেহ্ মাওউদ (রা.),
মালেইর–করাচী
(আল–ফযল পত্রিকা, রাবওয়া

অস্ট্রেলিয়ার নাসেরাত ও লাজনা সদস্যাদের সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত

২১ শে মার্চ ২০২১ তারিখে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী ১৩–১৫ বছরের ৪০ জনের অধিক নাসেরাতুল আহমদীয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করে।

সাক্ষাতানুষ্ঠানের সূচনাতে হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন যে সেখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) বন্যা এসেছে, আপনারা এখানে কিভাবে পৌঁছলেন? লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র এক সদস্যা বলেন– আমরা যেখানে একত্রিত হয়েছি সেই মসজিদের তিন দিকে জল আর অন্য দিকটিতেও রাস্তার উপর বন্যার জল দাঁড়িয়ে। হুযুর একথা শুনে নিজের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে জিজ্ঞাসা করেন যে, যে সব মেয়েরা এখানে এসেছে তারা ফিরে যেতে পারবে, না কি রাতে এখানেই থাকবে? উত্তরে লাজনা সদস্যা বলেন– এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ক্লাস শেষ হওয়ার পরই নেওয়া সম্ভব। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন যে রাতে থাকার ব্যবস্থা কি করা হয়েছে? বিছানাপত্রের জোগাড় রয়েছে কি? লাজনা সদস্যা উত্তর দেন, 'বিছানা পত্রের ব্যবস্থা আছে।' হুযুর আনোয়ার পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, 'মেয়েরা যদি রাত্রিতে এখানে থাকে সেক্ষেত্রে সকালে নাস্তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে কি? আর বন্যার কারণে নাস্তার ব্যবস্থা করতে অসুবিধা হবে না তো?' এর উত্তরে লাজনা সদস্যা বলেন, 'জ্বি হুজুর! নাস্তার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। (একথা শুনে হুযুর আশ্বস্ত হন এবং চেহারায় হাসির রেখা স্পষ্ট হয়)

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। এরপর হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর উদ্ধৃতি ও নযম উপস্থাপন করা হয়। এক ঘন্টা ব্যাপি এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নাসেরাত মেয়েরা হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

এক জন নাসেরা প্রশ্ন করে যে, যদি এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন কোনও পুরুষ নেই, সেক্ষেত্রে কি মেয়েরা কুরবানীর পশু জবেহ করতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ করতে পার। যদি তোমার মাঝে পশু জবেহ করার মত সাহস থাকে, তবে নিঃসন্দেহে জবেহ করতে পার। কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু একথাটিও মাথায় রাখতে হবে যে, অনেক ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে যাতে পশুর বেশি কষ্ট না হয়। দ্রুত একবারে জবেহ করতে হবে। তাই যদি সাহস থাকে তবে জবেহ করতে পার। (হুযুর মৃদু হেসে বলেন) তোমাকে কে বলেছে যে কুরবানী জবেহ করার কেবল পুরুষদের কাজ?

* স্কুলের পড়া এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে পাশাপাশি নিয়ে চলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে হুযুর আনোয়ার উত্তরে বলেন– 'আপনাকে বেশি সময় স্কুলের পড়ায় ব্যয় করতে হবে আর এক ঘন্টা বা আধ ঘন্টা নাসেরাতের পাঠ্যক্রমের জন্য বা ইসলামী শিক্ষা সংক্রান্ত বই–পুস্তকের অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট। তাই দুই তিন ঘন্টা বা স্কুলের পড়া পুরো করতে যতটা সময় আপার প্রয়োজন তা ব্যয় করুন। আর শুধ এক বা আধ ঘন্টা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের কাজে ব্যয় করুন। এতটুকুই যথেষ্ট। এভাবে আপনি স্কুলের শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা উভয় থেকে লাভবান হবেন।

একজন নাসেরা হুযুর আনোয়ার কে জিজ্ঞাসা করেন যে রমযান মাসে সেহরী ও ইফতারিতে তিনি কোন কোন খাবার খেতে পছন্দ করেন? হুযুর আনোয়ার বলেন,'আমি সচরাচর যে খাবার দিয়ে নাস্তা করি তা সেহরিতে খাই আর যে দিনের বেলায় যে খাবারটুকু খাই তা দিয়ে আমি ইফতার করি। আর যেহেতু আঁ হযরত (সা.)–এর সুন্নত, তাই ইফতারির সঙ্গে খেজুর যোগ করে নিই। আর সচরাচর লোকেরা যেসব আজেবাজে খাবার খায়, যেমন– সিঙাড়া, তেলেভাজা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় খাবারগুলি আমি মোটেই খাই না। আর আমি এতটা বেশিও খাই না যে ইফতারির পর অস্বস্তি বোধ হয় আর সকালে রোযা রাখতে ওঠার সময়ও তা

এরপর ৯ পাতায়.....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir